খলসেখালির গঞ্জ

শক্তিপদ রাজগুরু

ক ল্লো ল
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

A Bengali Novel
by Saktipada Rajguru

প্রকাশক : কুণালকান্তি ঘোষ
কল্লোল। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সামন্ত

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

ISBN 81-87098-00-7

পঁয়তাল্লিশ টাকা

বসন্তবাবু খলসেখালি ফরেস্ট অফিসে বদলি হয়ে এসে প্রথম নজরেই জায়গাটাকে দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারে না যে, এ-জায়গাটা তার পক্ষে কেমন হবে।

এর আগে সে ছিল তরাই অঞ্চলের কোন বিট অফিসে। ওদিকের বন বেশ গভীর। প্রধানত শালগাছের সংখ্যাই বেশী। নধর বলিষ্ঠ গাছগুলো। শাল ছাড়াও কিছু সেগুন, অন্য গাছও আছে।

তবে আমদানী ভালো হয় শালকাঠ থেকেই।

এক একটা গাছের দাম কয়েক হাজার টাকা। এসব পাচার করার লোকেরও অভাব নেই। এক ট্রাক মাল পাচার করতে পারলে লাখ কয়েক টাকা আসে। এদিকে-ওদিকে প্রণামী দিয়েও তাদের বেশ কিছু টাকা থাকে।

এহেন লাভজনক ব্যবসায় মানুষ সহজেই আসে।

তাই বনবাবুদেরও আমদানী মন্দ হয় না। কিন্তু বদলির চাকরী, ক'বছরেই যা হোক কামিয়ে নিতে হয়; তারপর আবার কোন বনে যেতে হবে, সেখানে কি আমদানী হবে কে জানে?

বসন্ত গোলদার সেই আমদানীর জায়গা চেনে। এসে পড়েছে এই সুন্দরবনের খলসেখালির বন অফিসে বদলি হয়ে।

এখানে এসে মন-মেজাজও ভালো নেই তার।

মানুষের বসতির শেষ অঞ্চল। এর পরই শুরু হয়েছে সুন্দরবনের অরণ্য।

এখানে শালগাছ নেই। নোনা মাটিতে গজায় কেঁওড়া-গরান-বাইন, সুন্দরী এই ধরনের নোনা বাদার গাছ। তবে এই বন খুবই ঘন—উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও এর ঘনত্ব খুব বেশি। আর এসব গাছ বিশেষ কাজে লাগে, তাই এর দামও কম নয়।

খলসেখালির গঞ্জে এসে বসন্তবাবু ক'দিনেই জায়গাটা চিনে ফেলে। শেষ জনবসতি হলেও খলসেখালির গঞ্জ বেশ সাজানো-গোছানো।

হাটতলাতেও বাঁধা দোকান কিছু আছে। ওদিকে কৈলাস ডাক্তারের 'অল ইন ওয়ান' ডাক্তারখানা।

মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারার কৈলাস ডাক্তার হোমিও-প্যাথি, এলোপ্যাথি, কবরেজী সব চিকিৎসাই করে রোগী বুঝে। সস্তার হ্যারিকেন জ্বেলে ওর ডাক্তারখানার ঘরে গঞ্জের দু-চার জন এসে বসে।

কৈলাস ডাক্তারের কাছেই শোনে বসন্ত এই খলসেখালি গঞ্জের রূপলাল মান্নার কথা।

কৈলাস বলে—ওর সঙ্গে দেখা করুন মশাই। বাদাবনের ওই-ই এখন সর্বেসর্বা। রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলতে পারেন।

এই হাটতলা, গঞ্জ, করাতকল—মাছের আড়ত—এসব ওনারই! ওই এক দেবতাকে পুজো দেবেন, ব্যস নিশ্চিন্তে থাকবেন।

বসন্ত গোলদার সরকারী কর্মচারী।

তার নিজের পদমর্যাদা আছে। তাই যেচে রূপলালবাবুর ওখানে যায়নি। অফিসে কাজ নিয়ে ফরেস্ট কলোনীতেই থাকে। অবশ্য এর মধ্যে স্পিডবোটে আশপাশের জঙ্গলেও কিছুটা ঘুরে এসেছে।

মাঝে মাঝে তাকেও ফরেস্টের নৌকা নিয়ে কূপে যেতে হয় গাছ কাটাই-এর ব্যবস্থা করতে।

ইদানীং এই অঞ্চলে গেঁও, বাইন কাঠের খুবই চাহিদা বেড়েছে। এখন খলসেখালি আর ওদিকে কিছু দূরে পুঁইজালিতেও গড়ে উঠেছে কোন বিদেশী কোম্পানীর করাতকল। বনের কাঠ চিরে তক্তা বানিয়ে তাই দিয়ে চায়ের পেটি বানায় ওরা।

খলসেখালির করাতকল অবশ্য পুরনো—এটা ওই রূপলাল মান্নার।

বসন্ত গোলদার সুযোগসন্ধানী লোক। সে জেনেছে দুই কোম্পানীর মধ্যে বেশ রেষারেষি আছে।

সেদিন অফিসে একটি তরুণকে আসতে দেখে চাইল বসন্ত। ওর আসাটা অবশ্য আগেই দেখেছিল বসন্ত।

অফিসের ওদিকে ভেড়ি। তারপরই বড় গাঙ। ওই গাঙ দিয়ে স্পিডবোটটাকে আসতে দেখে। সাদা-লাল রঙের ঝকঝকে স্পিডবোট

এসে ফরেস্টের জেটিতে লাগে। তার থেকে নেমে আসে ওই তরুণটি।

দেখেই মনে হয় এই অঞ্চলের লোক ও নয়। পরনে প্যান্ট একটা আকাশী রঙের গেঞ্জি। পায়ে কাদায় চলার জন্য গামবুট।

ভদ্রলোক এসে নমস্কার জানিয়ে কার্ডটা এগিয়ে দেয়।

বসন্ত দেখে নামটা। ওই পুঁইজালি করাতকলের ম্যানেজার।

বসন্ত জানে এবার দরদামের কথাই হবে। কাঠ চাই ওদের, অনেক কাঠ। অবশ্য এ-বনে তার অভাব নেই।

অনিমেষ বলে—আমাদের কারখানার প্রোডাকশনের জন্য ভালো গাছ চাই। যতটা দিতে পারেন। অবশ্য তার জন্য—আপনাকেও খুশি করে দেব।

বসন্ত দেখছে ওকে, বলে—গাছ তো বেশী দেবার আইন নাই।

হাসে অনিমেষ। ব্যাগ থেকে মোটা খাম একটা বের করে বলে —দশ হাজার আছে। আরও পাবেন মাসে মাসে, কাঠ আমাদের ঠিকমত দিয়ে যান।

বসন্ত জানে আমদানী তার এখানেও হবে। তাই ওটা ড্রয়ারে পুরে বলে—জানেন তো স্যার, আমাদের হাত বাঁধা। তবু চেষ্টা করছি—এখন নেতী ধোবানী ব্লকে কাজ চলছে। ওখানে প্রচুর ভালো গাছ আছে। ওখানের পারমিটই দিচ্ছি—

অনিমেষবাবু পারমিট নিয়ে চলে যায়। বসন্ত গোলদারও খুশী।

অনিমেষ বলে—ক্যাম্পে তো থাকবেন। ওখানেই দেখা হবে।

অর্থাৎ বন কাটাই হবার সময় বনে ভাসমান নৌকায় বিট অফিসার থাকে—সে সময়ই বাকী টাকা পেমেন্ট হবে।

বিট অফিসের দেওয়ালেরও কান আছে। অনিমেষবাবুর সঙ্গে গোপন লেন-দেনের খবরটা পৌঁছে যায় রূপলাল মান্নার কাছে।

রূপলাল মান্না এই খলসেখালি গঞ্জের মুকুটহীন সম্রাট। সেও খবর রেখেছে এখানে নতুন বনবাবু এসেছে।

রূপলালেরও বিরাট করাতকল এখানে। এইখানের বড় ব্যবসায়ী

সে। নিজেই এই আবাদকে এখন গঞ্জে পরিণত করেছে।

এখানে সকলে তার কাছেই আসে। বনবিভাগের কর্তারা, কাস্টমস-এর লোকজন, বর্ডার ফোর্সের অফিসার মায় জেলাসদরের নেতারা এখানে এলে তার গেস্টহাউসেই থাকে।

তাদের আপ্যায়নও করে রূপলাল মান্না।

নিজের লঞ্চে করে তাদের বনেও ঘুরিয়ে আনে। মাছ, মাংস যথাযথ বিদেশী পানীয়ও যোগায়। অবশ্য তার বিনিময়ে রূপলাল মান্না রাতের অন্ধকারে কিছু বাণিজ্যও করে।

তার নিজেরই লঞ্চ স্পিডবোট আছে, নিজের বাহিনীও কম নয়। সুন্দরবনের ওপারেই বাংলাদেশ। ওখানেও বেশ কিছু প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। গহন রাতের অন্ধকারে এদিক থেকেও ওষুধ—পার্টস—চাল—সুতিকাপড়—বস্তা বস্তা নুন ইত্যাদি পাচার করে আর ওদিক থেকে সেই লঞ্চে আনে লবঙ্গ, বিদেশী বহু জিনিসপত্র, মায় সোনার বিস্কুটও আমদানী করে। করাতকলের কাঠের মাল চালানের জন্য বিশাল দু'হাজার-আড়াই হাজার মণী চৌধুরী নৌকায় কাঠ, কাঠের বাক্স চালান দেয় কলকাতায়, লঞ্চে ওই বিশাল নৌকাগুলো টেনে নিয়ে যায়। ওর মধ্যেই ওসব মালও নিরাপদে পাচার করে রূপলাল।

তার মাল এদিকের পুলিশ ছোঁয় না বিশেষ কারণে। ফলে রূপলালের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে ভালোভাবেই।

রূপলাল ভেবেছিল ওই পুঁচকে বনবাবু এখানে এসে প্রথম তাকেই সেলাম দিয়ে যাবে। কিন্তু আসেনি।

কৈলাস ডাক্তার এখানে আসে রূপলালের বৈঠকখানায় সকালের আড্ডায়। সেখানেই শোনে রূপলাল ওই বসন্ত গোলদারের কথা।

লোকটা একটু হামবড়া ভাবের।

রূপলালেরও কাঠের দরকার, তাই বনবিভাগের গাছকাটার পারমিট তার চাই। আর রূপলাল বিশেষ ব্যবস্থায় এক পারমিট তিনবার দেখিয়ে তিনগুণ মাল আনে।

ফলে ওই বিদেশী কোম্পানীর কারখানার থেকে তার প্রোডাকশন বেশী আর খরচাও কম পড়ে। তাই বনবাবুকে তার হাতে রাখা দরকার। অবশ্য সেও তার জন্য বনবাবুদের খুশী রাখে।

কিন্তু এই বিট অফিসার তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, উল্টে তাকে না জানিয়ে ওই অন্য করাতকলের ম্যানেজারকে বেশী গাছের পারমিট দিয়ে বসে আছে।

রূপলাল মান্না তার ঘরে বসে হিসাবপত্র দেখছে। তার ওই বাহিনীর অন্যতম নেতা সনাতনই খবরটা এনেছে।

সনাতন দেখতে খুবই সাধারণ চেহারার। এদিকে নোনা জল-হাওয়া রংটা তামাটে। বেশী লম্বা চওড়া চেহারা। মুখে একটা শান্ত ভাব।

রূপলালের মতই। রূপলাল মান্নাকে দেখে মনে হবে খুবই সাধারণ মানুষ। নিপাট নিরীহ ভালোমানুষ। হেসে কথা বলে। গলার স্বরটাও নরম। কিন্তু এ যেন বাঘের থাবা। গোটানো যখন থাকে তখন নরম। বোঝাই যায় না যে ওর আড়ালে রয়েছে ধারালো নিষ্ঠুর নখগুলো, যা শিকারকে নিমেষের মধ্যে ফালা ফালা করে দেয়।

ওই সনাতনও তেমনি। ওর গলাতে আবার কুণ্ঠাও আছে। যেন পরম ভক্তই। কিন্তু সনাতনের অসাধ্য কোন কাজ নাই। আর সেগুলো খুব সহজ ভাবে ঠাণ্ডা মাথাতেই করে। তার লোকজনও সর্বত্র ছড়ানো। আবাদ মায় গাঙের অনেক খবরই আনে তারা।

রূপলাল সব শুনে স্থিরকণ্ঠে বলে।

—ঠিক খবর তো?

সনাতনের লোকরা ভুল খবর আনে না। সে বলে—পাকা খবর মান্নাবাবু, ওই ব্যাটা ম্যানেজার নিজে এসে পারমিট নে গেছে। আর দশহাজার টাকা দিয়েছে—আরও দেবে বলেছে।

রূপলাল কি ভাবছে। তার কার্যস্থির করতে সময় বেশী লাগে না। বলে সে—ঠিক আছে।

সনাতন তার দলবল নিয়ে গাঙ দাপিয়ে বেড়ায়। অন্য চালানকারীদের মাল বেশী থাকলে ভাগ ঠিকমত না পেলে তাদের নৌকায়

হামলা করে।

বিশাল, বিস্তীর্ণ গাঙ। এখানে নৌকায় ডাকাতিও প্রায় হয়। বাধা দিলে তাদের মেরে গাঙের অতলে ফেলে দেয়, কুমির কামটের ভোজে লাগে তারা। তাদের আর কোন নিশানাই থাকে না। এসব গাঙে কামটের দল থিক থিক করছে, জ্যান্ত মানুষ গাঙে পড়লে তারও রেহাই নাই। ধারালো দাঁত দিয়ে তারা খুবলে খাবে তাদের।

সনাতন বলে, —এখন কিছু করতে হবে কি?'

অর্থাৎ তারা ওই অবাধ্য বনবাবুকে সমঝে দিতে চায় যে এখানে সরকার বলতে তারাই।

রূপলাল বলে, —এখন থাক। সময় হলে বলবো, তোরা যা—

আজ রাতে এক চালান মাল যাবে তার ব্যবস্থাপত্র করগে। ওদিক থেকেও মাল যা আসবে সাবধানে এনে ঘাটে ওই মালবোঝাই কাঠের নিচে পাচার করে দিবি।

বসন্ত গোলদার ওই ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে চাইল। এখানে দামী ধুতি—হীরার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবী পরা মানুষের সংখ্যা খুবই কম, পায়ের জুতাটাও দামী।

—নমস্কার।

বসন্তবাবু চাইল। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দেয়।

—আমার নাম রূপলাল মান্না।

চমকে ওঠে বসন্ত, ওই লোকটির নাম অনেক শুনেছে। সে যে নিজেই যেচে এখানে আসবে তা ভাবেনি।

বসন্ত বলে—বসুন।

রূপলাল বসে পকেট থেকে বিলাতী বেনসন হেজ কোম্পানীর সিগারেট আর সোনার লাইটার এগিয়ে দিয়ে বলে,

—চলে তো?

বনবিভাগের কর্মীদের অধিকাংশেরই ওই ধূমপানের অভ্যাসটা থাকে না। এমন দুর্গম স্থানে থাকতে হয় যেখানে সিগারেট সবসময়

মেলে না। আর গ্রীষ্মের বনে ঝরাপাতার বুকে ওই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো বনের বিপদ আনতে পারে তাই ধূমপান করা বনকর্মীদের পক্ষে বিপজ্জনকই।

আর বেশ একটা খরচার ব্যাপারই।

বসন্ত গোলদার তাই ওটাকে পরিহার করে চলে।

বলে বসন্ত রূপলালকে, —আজ্ঞে ওটা চলে না।

হাসে রূপলাল—তাহলে এটা চলে তো?

ইশারা করে বোতলের চেহারাটা দেখায়। বসন্ত বলে,

—আজ্ঞে না। নেশাভাং আমার চলে না।

হাসে রূপলাল, অবাক হবার ভান করে বলে,

—পরের পয়সাতেও না?

বসন্ত ঘাড় নাড়ে—না। না। ওসব চলে না।

রূপলাল দেখছে ওকে। যে লোক পরের পয়সাতেও সিগারেট-মদ খায় না, সে যে খুব সহজ লোক নয় তা বুঝেছে।

বলে সে—তাহলে শুকদেব গোঁসাই-ই বলা যেতে পারে। কি করে যে আপনার খাতির করি! যাকৃগে—কাজের কথায় আসা যাক। আমার একটা ছোট করাতকল আছে, তাতে কিছু কাঠের পারমিট পাই, ওটা যদি দেন। বাইন—গরাণ—কাঠই চাই। নেতী ধোবানী ব্লকে এখন কাটাই হচ্ছে, ওই ব্লকেই দিন শতখানেক টনের পারমিট।

বসন্ত হিসেবী লোক। সে ওই বন অঞ্চল এর মধ্যে ঘুরে এসেছে। তার মনে হয় ওই কাঠের পারমিট সে দিতে পারে।

কিন্তু একটু মোচড় মারতে হবে, আখেও জোর মোচড় না মারলে রস বের হয় না। তাই রূপলালের থেকে বেশী কিছু বের করার জন্য মোচড় মারে—এত গাছ তো ওখানে হবে না স্যার।

রূপলালের মুখে চকিতের জন্য কাঠিন্য ফুটে ওঠে। এভাবে কেউ তার মুখের উপর জবাব দেবে এখানে তা ভাবতেই পারেনি সে।

তাই একটু অবাক হয়েছিল রূপলাল ওই পুঁচকে বনবাবুর জবাবে। তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে মিষ্টি কথা বলাটা সে অনেক চেষ্টায় রপ্ত করেছে।

বলে রূপলাল, —কিন্তু স্যার, কাঠ না পেলে আমার করাতকল যে বন্ধ হয়ে যাবে। জানেন তো আবাদ অঞ্চল, গরীবের দেশ। তবু কিছু লোক ওখানে কাজ করে একবেলাও একমুঠো অন্ন জোটায়; তাদের গ্রাসও কেড়ে নেবেন?

বসন্ত বেশ ভারিক্কি স্বরে বলে

—পঞ্চাশ টনের পারমিট দিতে পারি। তার বেশী পারব না।

রূপচাঁদ জানে ওই বসন্ত গোলদার এর আগে ওই অনিমেষবাবুকে দুশো টনের পারমিট দিয়েছে।

রূপলালের রাগটা ঠেলে উঠতে চায়। তবু সেটা চেপে রেখে বলে —মাসে মাত্র পঞ্চাশ টন? কি হবে ওতে?

বসন্ত বলে—অন্য মহাজনদের কাছে কিনুন।

রূপলাল তাও করে। কিন্তু তাকে এভাবে ফেরাবে ভাবতে পারেনি। জানে রূপলাল এর পর সে কি করবে। ওই অনিমেষবাবুকে ও দেখবে সে, কি করে তারা এখানে করাতকল চালায় তাও দেখবে।

এই আবাদে তার প্রাধান্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হোক এ চায় না সে।

বলে—তাহলে এর বেশি কিছু হবে না?

বসন্ত বলে—দেখি ওখানে গিয়ে। তারপর চেষ্টা করবো।

একেবারে জবাব দিতে চায় না। অর্থাৎ বসন্ত চায় এবার রূপলাল-বাবু দেনাপাওনার কথাটাই বলুক।

কিন্তু রূপলাল উপযাচক হয়ে এসব কথা বলে না। তার কথামত কাজ করে দিলে সে ওদের খুশী করে।

তাই রূপলাল ওই পথেই যায় না।

বিনীতভাবে জানায়—দিলে খুব উপকার হতো স্যার।

বসন্ত যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি। সে মন দিয়ে অন্য কি ফাইল পড়ছে।

বের হয়ে এল রূপলাল।

রূপলালের উপরটা যত নরম, ভিতরটা তা মোটেই নয়। এক ধরনের

মানুষ আছে, তারা বাইরে ভিতরে এক। রূপলাল তার ভিতরের সত্তা-টাকে একেবারে লুকিয়ে রাখে।

সনাতনও হাজির।

শুধোয় সে—কি বলে ওই বনবাবু?

রূপলাল বলে, —ব্যাটা এখনও ল্যাজে খেলছে।

সনাতন অবাক হয়।

—আপনার সঙ্গে ল্যাজে খেলতি চায় কত্তা! এত বড় হিম্মৎ ওই বনবাবুর?

—চোপ!

রূপলাল থামিয়ে দেয় ওকে।

অবশ্য এই নির্জন নদীর ভেড়িতে আর কেউ নেই।

গ্রামবসত ভেড়ির ওদিকে। নদীতে ঢেউয়ের মাতামাতি চলেছে। দূরে দু'একটা নৌকা ভেসে যায়।

রূপলাল বলে, —খবর রাখ কুপে ওই বনে কখন যায় ব্যাটা।

ওকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

সনাতন বলে—একেবারে গাঙের তলায়। কন তো দিই সেখানেই পাট্রে।

রূপলাল বলে, —না—না। ওসব করিস না। বেশ আচ্ছাসে দু'চার ঘা দিয়ে ওকে একটু মালুম করিয়ে দিবি বাদাবনে থাকতে গেলে আমার কথামতই চলতে হবে, তবে যেন টের না পায়, তাহলে পুলিশের ঝামেলা করার চেষ্টা করবে ব্যাটা।

সনাতন এবার কর্তার মতলব বুঝেছে।

বলে সে, —তাই হবে বাবু। দেখছি ব্যাটাকে।

রূপলাল বলে, —তুই ওই কাজটা করে সরে পড়বি, পরের কাজটার ব্যবস্থা আমিই করবো।

সনাতন বলে—তাই হবে।

ওদিকের করাতকলের ঘাটে দুটো নৌকা এসেছে, সনাতন বলে।

—ওদিকে যাই। কিছু মাল আসার কথা আছে।

চলে যায় সনাতন।

রূপলাল ভেড়ির উপর দিয়ে আসছে। সমুদ্রের ছোঁয়ায় এসব নদীতে জোয়ার-ভাটার পালাবদল হয়। জোয়ারের সময় নদীর জল ঠেলে ওঠে। সেই জলরাশিকে আটকাবার জন্য চারিদিকে উচু বাঁধ দিয়ে সারা এলাকা ঘিরে রাখতে হয়।

ওই ভেড়ির ওদিকে গ্রামবসত, হাটতলা। ওপাশে নদীর ধারে তার মাছের আড়ত।

ওখানে দুটো ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে।

রূপলাল মাছের ব্যবসা শুরু করেছিল এখানে প্রথম এসে। সে অনেকদিনের কথা। তাতে লোকসান দিয়ে তখন একটা ডিঙিতে কাঠের ব্যবসা শুরু করে।

অবশ্য তখনও ওই মাল পাচারের কাজই ধরে তবে গোপনে।

আজ তার এখানে রাজত্ব গড়ে উঠছে।

মাছের আড়তও করতে চায়নি। কিন্তু বাধ্য হয়েই রূপলাল মাছের ব্যবসাতে নামে। সেও এক বিচিত্র ইতিহাস।

রূপলালের মনে এখন ওই বসন্ত গোলদারের কথাটাই ভাসছে। ওই অনিমেষকেও সে শিক্ষা দেবে, আর বসন্তকেও, তবে সময়মত।

বসন্ত গোলদারের পর্বটা আগেই চুকোনো দরকার।

বনের মধ্যে গাছ কাটাই করে কাঠের ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে অগ্রিম কাঠের দাম বাবদ টাকা দিয়ে। আর বনবিভাগ থেকে গাছগুলোকে নির্দেশিত করা হয়। সেইসব গাছই কাটার নিয়ম।

এইসব কাজের জন্য বনের কর্মীদের বনে যেতে হয় কাঠ কাটাইয়ের জায়গায়। তাই তাদের জন্য সরকারী নৌকাও আছে। তাতে থাকার জায়গা, রান্নার ব্যবস্থা, বাথরুম ইত্যাদি আছে। তাতে দরকার মত অফিসের কাজও করা যায়।

ফরেস্টের বোট নিয়ে বসন্ত গোলদার দাঁড়ি মাঝিদের নিয়ে সেই

বনের মধ্যে গেছে।

সেখানে কাঠ মহাজনদের নৌকা, লোকজন, কাঠুরের দলও থাকে।

বনবাবু ওখানে তার নৌকায় বসে সরকারী কাজ দেখার নাম করে বাণিজ্যও করেন।

সেই নৌকা বসত—বনভূমি তাদেরই রাজ্য।

বসন্তবাবু চলেছে। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা। কোথা থেকে মুরগী জুটেছে আবার গাঙে কোন জেলে ডিঙি থেকে বনবাবুর জন্য সেরা ভেটকী পার্শেও সংগৃহীত হয়েছে।

নৌকা চলেছে। গাঙের বিস্তারও বাড়ছে। দূরে দেখা যায় বনসীমা। ওরা এবার সুন্দরবনের মধ্যেই এসে পড়েছে।

তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার। হঠাৎ দুপাশ থেকে দুখানা আট দাঁড়ির ছিপ জাতীয় নৌকা অন্ধকারের মধ্যে এসে বনবিভাগের নৌকায় উঠে প্রথমেই কোণে রাখা রাইফেলটা তুলে নেয় আর নিমেষের মধ্যে তাদের কাজও শুরু হয়।

বসন্ত গোলদার কি বলার চেষ্টা করতে মুখে গামছা জড়ানো একটা লোক সপাটে তাকে একটা চড় কসাতে বসন্ত টাউরি খেয়ে কোনমতে সামলে নেয়। ওদের বাধা দেবার সাধ্যও আর নেই।

বসন্ত গোলদার ভাবতেই পারেনি যে রাতের অন্ধকারে কারা এসে তার সরকারী বনবিভাগের নৌকায় হানা দিয়ে তাকে পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে যাবে, আর সেইসঙ্গে সরকারী কাগজপত্র, কাঠকাটার পারমিটবই, অন্যসব কাগজ ছিঁড়ে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তার ক'দিনের রেশন অর্থাৎ চাল, ডাল, নুন, তেল মায় খাবার জলটুকু অবধি নিয়ে যাবে অর্থাৎ একেবারে ধনে-প্রাণে বধ করার ব্যবস্থা করে যাবে তা ভাবেনি।

অবশ্য সুন্দরবন এলাকায় এমন চুরি-ডাকাতি প্রায়ই হয়। এখানকার বেপরোয়া মানুষদের অনেকেই এসব কাজ করে বাঁচার তাগিদে, কিন্তু তারা চড়াও হয় সাধারণত কাঠ-মহাজন, যাত্রী, বর-

যাত্রীদের নৌকায়। তাই বলে সরকারী নৌকায় ডাকাতি করবে? মারবে এইভাবে বনবাবুকে?

সমুদ্র এই অঞ্চলে তার থাবা বসিয়েছে অনেক দূর অবধি। ছোট-বড় খাঁড়ি তৈরি হয়েছে অনেক। নদীগুলো জাল বুনেছে সামান্য মাটিকে কেন্দ্র করে। মাটিটুকুও ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টিতে বিভক্ত। আর সুন্দরী, বাইন, কেওড়া, গরান, পশুর, হিতাল, গোলপাতা নানা গাছে ঠাসা। মানুষ এখানে অবাঞ্ছিত, তাই এ বনে মানুষের খাবার মতো কোনো ফল হয় না। চারিদিকে জল, তবু এক বিন্দু জলও মানুষের পানযোগ্য নয়। এখানে নদীতে কামট-কুমিরের ভিড়। জ্যান্ত মানুষ পড়লে খেয়ে ফেলতে কয়েকটা মিনিটই যথেষ্ট। তবু আবাদ অঞ্চলে থাকে কিছু মানুষ, যারা বেঁচে থাকার তাগিদে নদীর সঙ্গে, আদিম অরণ্যের সঙ্গে দুর্বার লড়াই করে নিত্যদিন।

নদীগুলোয় ভাটার সময় জল নেমে যায়, কাদাভরা রিক্ত নদীর বুক জেগে ওঠে। আবার জোয়ারের সময় সেই নদীতেই মত্ত সমুদ্রের সাড়া জাগে। তাই নদীগুলোকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে হয়। চারিদিকের বিস্তীর্ণ ভেড়িবাঁধই বাঁচিয়ে রাখে নির্জন বনপ্রান্তের এই ছোট্ট বসত। বাঁচিয়ে রাখে ধানক্ষেতকে। বর্ষার জলে ওখানে সবুজ ধানের চারাগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে, শীতের মুখে সবুজ ধানে আসে সোনার ছোঁওয়া। আবাদের মানুষ ক'টা মাস অন্নের মুখ দেখে। আর কোনোবার যদি ভেড়িবাঁধ ভেঙে যায়, গাঙের নোনাজলে ডুবে যায় মাঠ, বসত, সেবার ধানও হয় না। এইভাবে সারা বছর ধরে চলে গাং আর বনের সঙ্গে লড়াই। জোরদার লড়াই।

খলসেখালিই এই অঞ্চলের শেষ বসত। এদিকে বিশাল রায়মঙ্গল, ওপার দেখা যায় না। একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে বাংলাদেশের দিকে। বন সেখানে আরও গভীর।

খলসেখালির অন্যদিকে ছোট নদী। তার অন্য পারে শুরু হয়েছে অরণ্যের বিস্তার। তিরিশ-চল্লিশ মাইল দীর্ঘ বন শেষ হয়েছে সমুদ্রের ধারে গিয়ে।

রূপলাল মান্না এই খলসেখালিতে এসে কাঠের ব্যবসা শুরু করেছিল প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেদিন তাকে কেউ চিনত না। এসে পৌঁছেছিল ভাগ্যের হাতছানিতে রূপলাল পুঁইজালির হাটতলায় ফেরি-লঞ্চে। সেখান থেকে জেলেদের ডিঙিতে এক গোনের পথ এই খলসে-খালির বসতে। সেদিন খলসেখালি বসত বলতে ছিল কয়েক ঘর বাওয়ালি আর মাছমারাদের চালাঘর, গাঙের ধারে উলুখড়ে ছাওয়া একটা চালাঘর। ওইটাই মাছমহাজনদের খুঁটি। দিনে দিনে কিছু মাছমারাদের নৌকা আসত গাঙের মাছ নিয়ে। দু-একজন মহাজন সেই মাছ কিনে ডিঙিতে পাঠাত পুঁইজালির হাটে। সেখানে বরফ দিয়ে লঞ্চে সেই মাছ রাতভোর পাড়ি দিয়ে চলে যেত বসিরহাটের আড়তে।

রূপলাল এসে ওই মাছের খুঁটিতেই আশ্রয় নিল। আশেপাশে জেলেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু জিনিস যেমন চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, কুমড়ো, লঙ্কা, বিড়ি-তামাক এসবের দু-একটা দোকান ছিল। তার ওদিকেই বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল খলসেখালি ফরেস্ট অফিস। বনের লাগোয়া অঞ্চল, মাঝখানে একটা ছোট খালের ব্যবধান। এপারের বসতেও অরণ্যের প্রভুদের আনাগোনা আছে, তাই ফরেস্ট অফিসের ঘরগুলো উঁচু পাটাতনের উপর তৈরি। ওদিকে কাঠের তৈরি অফিসঘর, এপাশে বাবুদের কোয়ার্টার। গাঙে কাঠ দিয়ে জেটিমত করা আছে, দু-চারটে নৌকা যাতায়াত করে। বন-বিভাগের নৌকাও দু-একটা গেরাপি করা থাকে জেটিতে। আর এখানেই রয়েছে একটা টিউবওয়েল। এতে মিঠে জল ওঠে অফুরান। তাই পথচলতি নৌকার মাঝি বাওয়ালিরা এখানেই জল তুলে তাদের নৌকায় ক'দিনের জলের রসদ তুলে নেয়।

রূপলালের সন্ধানী চোখ এই নির্জন বিপদসঙ্কুল বাদাবনেও যেন পথ খুঁজে পায়। ক'দিন ধরে জেলেদের নৌকায় বাদাবনের গভীরে ঘুরেছে, দেখেছে সুন্দরবনের অরণ্যসম্পদকে। বাইন গাছের অভাব নেই, রয়েছে অপর্যাপ্ত গরান গাছ। তার কাঠে ভালো খুঁটি হয়, জাহাজে

মাল পাঠাবার সময় ওই কাঠগুলো পেতে মাল সাজালে জল লাগে না। গরান কাঠের ছালও অনেক দামে বিক্রি হয়। চামড়া ট্যান করার জন্য ওর কষ খুবই দরকারী। আর বাইন কাঠের পাতলা টুকরো দিয়ে তৈরি হয় চায়ের পেটি। কলকাতার মহাজনরা ভালো দামে কিনে নেয় ওসব মাল, বিশ্বস্ত পার্টি হলে দাদনও দেয়। গুছিয়ে ওই কাঠের ব্যবসা করতে পারলে বিনা মূলধনেই হাজার হাজার টাকা আমদানি হতে পারে।

আর সেটা প্রকারান্তরে তখনকার বনবাবু গিরিধারীলালও সমর্থন করে। বনঅফিস থেকে ওই সব কাঠ কাটার জন্য কাঠের মাপমতো টাকা দিয়ে অনুমতিপত্র নিতে হবে। অবশ্য মারপ্যাঁচটা সেখানেই রয়েছে। রূপলালের মতো সন্ধানী লোক সেটাও জেনে ফেলে। গিরিধারীলাল পারমিট দেয় আর রূপলাল একই পারমিটে তিন বারে তিন গুণ কাঠ পাচার করে, অবশ্য গিরিধারীলালেরও মাসে বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে।

রূপলাল খলসেখালিতে ক্রমশ গেড়ে বসলো, ভাড়াটে নৌকা থেকে ক্রমশ নিজের নৌকা করলো ছোট-বড় সাইজের বেশ কয়েকটা। বেশ কিছু বছর কেটে যেতে ক্রমশ রূপলাল এখন নিজের বিশাল কাঠগোলা, করাতকল এসব গড়ে তুলেছে। খলসেখালি গঞ্জে, তার আশেপাশে এখন রূপলাল একটি বিশেষ নাম। নিজের লঞ্চ, ওদিকে গাঙের ধারে তুলেছে নিজের পাকাবাড়ি। বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটা মিঠে জলের পুকুর কাটিয়ে ঘাট বেঁধেছে। চারিপাশে গাছ-গাছালিও লাগিয়েছে অনেক। বাইরে থেকে বড় নৌকাবোঝাই মাটি, সার এনে ঢেলেছে। ঝাড়ালো হয়ে বেড়ে উঠেছে কলমের আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, আর নারকেল গাছ।

পেটা চেহারা রূপলালের। বনে বনে নৌকায়, স্পিড বোটে, লঞ্চে ঘোরে ব্যবসার জন্য। বাদাবনে বাঘের মুখোমুখিও হয়েছে কয়েক বারই। ভয় নেই ওর রক্তে। লম্বা-চওড়া শক্ত-পোক্ত চেহারার মানুষটাকে দেখলেই বোঝা যায় জেদী আর একগুঁয়ে। ফরেস্টের

লোকজন, এমনকি ফাঁড়ির পুলিশরাও রূপলালের উপর নির্ভরশীল। বনের গভীরে যেতে হয় তাদের। সম্বল শুধু নৌকা। গাঙও বিশাল, বর্ষায় তার রূপ বদলে যায়। চার ফিট, ছয় ফিট ঢেউ ওঠে। নৌকা নিয়ে যাওয়া তখন রীতিমতো বিপজ্জনক। অগতির গতি ওই রূপলাল-বাবুর লঞ্চ। তাই তাদের দরকার রূপলালবাবুকে। ঝড়-বাদলের সময় এই অঞ্চল সভ্যজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক গোনের পথ পুঁইজালি হাটতলাও তখন দুর্গম হয়ে ওঠে। কিন্তু রেশন তো চাই। রূপলালবাবুর ভাঁড়ার অফুরন্ত। সেখান থেকে পুলিশের, বনবিভাগের জরুরী রেশনও যায়।

রূপলাল মান্না বেশ জেনেছে যে এখানে তার প্রাধান্য কেউ সহজে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তাই রূপলাল সেটাকে আরও কায়েম করতে চায়।

তাই রূপলাল মান্না ওই মাঝ গাঙে বনবাবুর সরকারী নৌকাতেই পাঠিয়েছিল সনাতনকে তার দলবল নিয়ে যাতে ওই বসন্ত গোলদার বুঝতে পারে এখানে তাকে রক্ষা করার জন্য কেউ নেই, তার ওই মেজাজের কণামাত্র দামও এখানে কেউ দেবে না।

বসন্ত গোলদার অবশ্য ওই ঘটনার পরই নৌকা নিয়ে খলসেখালি গঞ্জে ফিরে পুলিশ ফাঁড়িতে গেছল। থানা এখান থেকে বেশ দূরে। এক জোয়ারের পথ ধনাখালি গঞ্জ।

তাই এখানেও শান্তিরক্ষার জন্য একটা পুলিশ ফাঁড়ি করা হয়েছে। ফাঁড়ির হাবিলদার-ইনচার্জ ফণীবাবু এখানের পুরনো লোক। এখানে এসে সে ওই রূপলাল মান্নার আড্ডার নিয়মিত সভ্য হয়ে গেছে। মাছের আড়ত থেকে মাছ, এখান-ওখান থেকে দুধ-মুরগী এসব আসে। আর কাঠ মহাজনদের কাছেও বাঁধা প্রণামী ছাড়া রাতের বেলায় যারা এখানের গাঙ বেয়ে ওপার থেকে দামী মালপত্র আনে তাদের কাছ থেকেও প্রণামী সংগ্রহ করে এখন নাকি মধ্যমগ্রামের কোন অভিজাত পল্লীতে বিশাল বাড়ি, শহরে দুতিনটে ট্যাক্সি এসব করেছে।

এহেন ফণীবাবু অবশ্য সব খবরই রাখে। বসন্তবাবুর ওই কাঁপ-ছুটকানো অবস্থা দেখে ফণীবাবু বলে।

—কেস লিখে নিচ্ছি তবে—

—তবে? আহত বসন্ত ফুঁসে ওঠে—তবে কি কিছু হবে না?

ফণীবাবু বলে—তদন্ত নিশ্চয়ই হবে।

সে জানে এর মধ্যে রূপলাল মান্না বনঅফিসে গিয়ে তার চাহিদা-মত পারমিট না পেয়ে ফিরে এসেছে।

ফণীবাবু চেনে রূপলালকে, তাই বলে

—তবে কি জানেন বসন্তবাবু, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করা কি ঠিক? বাদাবন বলে কথা—গহন গাঙ গহিন বনের মুলুক। এখানে একটু মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।

বসন্তবাবুও বুঝেছে ব্যাপারটা।

সেও পাকা মাথার লোক, বলে

—ঠিক আছে, কেস লিখে রাখুন।

ফণীবাবু বলে,—তা রাখছি। তবে এখানে চাকরী করতে হবে তো?

এখানেও থাকতে হবে। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন।

বসন্তবাবু ওখান থেকে এবার হাটতলায় কৈলাস ডাক্তারের কাছে আসে। হাটবারে খলসেখালির গাঙ নৌকার ভিড়ে ভরে যায়। আর হাটতলায় মানুষের ভিড় জমে।

দোকান পশারও আসে নৌকায়। আবার হাট সেরে ফিরে যায় গাঙ বেয়ে অন্যহাটে। সপ্তাহের সাতটা দিনই তারা হাটে হাটে ঘোরে।

কৈলাস ডাক্তারের সেদিন অবসর থাকে না। আগে থেকেই সে বড় বড় বয়ামে লাল নীল মিক্সচার, পুরিয়া বানিয়ে রাখে। জ্বর, পেটের অসুখ এসবের কেসই বেশী।

তার ওষুধই ভরসা। তাতেই যার সারবার সারে আর যার সারে

না তাকে এই দুনিয়া থেকে সরে যেতে হয়।

আজ হাটতলায় তেমন ভিড় নেই। দু-চারটে বাঁধা দোকান খোলা আছে মাত্র।

ওদিকে কৈলাসের ডাক্তারখানায় কৈলাস বসে বসে তিনদিনের পুরনো একটা খবরের কাগজ রূপলালের গদি থেকে এনে আগা-পাশতলা পড়ছে এমন সময় বসন্তবাবুকে ওই আহত অবস্থায় ঢুকতে দেখে চাইল।

অবশ্য খবরটা এর আগেই এখানে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। নৌকা লুঠ এখানে হামেশাই হয়, কিন্তু সরকারী বোটে ডাকাতিটা নতুন। তাই খবরটা ছড়িয়েছে।

কৈলাস বলে—একি কাণ্ড। বসুন, বসুন।

দেখেশুনে বলে—ব্যাটারা ডাকাতই নয়, খুনেও।

বসন্ত বলে—খুনই করতো। উঃ! কি নিষ্ঠুর মশাই।

—তাতো দেখছি। এইভাবে মেরামত করেছে! বসুন—ব্যাণ্ডেজ করে দিই। একটা ইনজেকশনও দিতে হবে। ওষুধ লিখে দিই। গায়ে, হাতে বেদনা?

বসন্ত বলে, —সর্বাঙ্গে ব্যথা। যা মেরেছে, টাটাচ্ছে! সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেল মশাই। থানাতেও খবর দিয়েছি।

অবশ্য তোষক বালিশ ফাটিয়ে যে তারা অনিমেষের কাছে পাওয়া বেশ মোটা টাকাও নিয়ে গেছে সেটা জানাতে পারে না বসন্ত।

তবু আপসোস করে—ধনে-প্রাণে মেরে গেল।

কৈলাস ডাক্তার তার মলম পট্টি করে ওষুধ পত্র দিয়ে বলে—বসন্তবাবু, এখানে পুলিশও কি করতে পারবে জানি না।

—তবে? এখানে অরাজকতা চলবে? আমি বনবিভাগের কর্তাদের জানাবো।

কৈলাস বলে, —ওসব করেও কিছু ফল হবে না। এখানে শান্তিতে বাস করতে হলে এখানের কর্তাকেই গিয়ে বলুন।

—এখানের কর্তা! বসন্ত অবাক হয়।

কৈলাস বলে—এখানের কর্তাকেই চেনেননি? আরে মশাই মান্না-বাবুর কাছে যান। বিদেশী লোক আপনারা, এখানে চাকরী করতে এসেছেন। ওর কাছে গিয়ে সব বলুন, দেখবেন ওর কথামত চললে এখানে কোন অসুবিধাই হবে না।

বসন্ত গোলদারও বুঝেছে এবার ব্যাপারটা। ওই লোকটিকেই সে চটিয়েছে এখানে এসে। কে জানে এসব ব্যাপারে তারও অদৃশ্য হাত আছে কিনা?

বসন্ত কোনরকমে এসে তার কোয়ার্টারে শুয়ে পড়ে।

প্রহারের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছে, ঘরে শুয়ে আছে।

বাহিরের অফিসঘর থেকে একজন গার্ড এসে জানায়।

—মান্নামশাই এসেছেন।

মেঘ না চাইতেই জল! বসন্ত কোনরকমে অফিসে আসে। রূপলাল মান্না বলে

—খবরটা শুনে এলাম। এ কি দিনকাল পড়লো বলুন তো? সরকারী চাকরীতে এসে এইভাবে হেনস্থা হতে হবে?

বসন্ত কাতরাচ্ছে।

রূপলাল বলে—আপনারা আমার গঞ্জের অতিথি, আপনাদের উপর হামলা হলে গঞ্জের বদনাম হবে যে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি সদরে খবর দিচ্ছি। এর বিহিত করতেই হবে।

একা আসেনি রূপলাল। কৈলাস ডাক্তারকেও এনেছে। তাকে শুধোয়—কেমন দেখলে হে ডাক্তার? আঘাত গুরুতর নয় তো? তাহলে আমার স্পিডবোটে ওকে বসিরহাট হাসপাতালেই পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

রূপলালের কথায় আন্তরিকতার সুর ফুটে ওঠে।

বসন্ত গোলদারও বুঝেছে লোকটা হয়তো খুবই ভালো, ছুটে এসেছে তার খবর নিতে নাহয় খুবই খারাপ। নাটক করছে। তবে এ যে দুর্দান্ত একটি লোক, এর পক্ষে সবই সম্ভব তা বুঝেছে।

ফণীবাবু, কৈলাস ডাক্তারের কথাও মনে পড়ে।

বসন্ত বলে—না—না। তেমন কিছু নয়।

কৈলাসও সমর্থন করে—না, মনে হয় তেমন ইনজুরি নয়।

—বাঁচলাম। রূপলালও যেন নিশ্চিন্ত হয়।

বলে সে—কদিন রেস্ট নিন বসন্তবাবু। কাজ-কর্ম পরে হবে। যা করবেন প্রাণ বাঁচিয়ে করবেন মশায়। আগে প্রাণ তারপর চাকরী। যা দিনকাল পড়েছে—

রূপলালবাবুকে বসন্ত এবার নতুন করে চিনছে।

এরপর থেকে বসন্ত বুঝেছে এখানে থাকতে গেলে রূপলালবাবুকেই ভজনা করতে হবে।

তারপর আর রূপলালবাবুর পারমিটের কোন অসুবিধাই হয়নি। আর বসন্ত গোলদারও এখন নিশ্চিন্তে আছে। যখন তখন নৌকা নিয়ে যাতায়াত করে।

এই প্রতিষ্ঠা রূপলাল একদিনে অর্জন করেনি। এর জন্য তাকে অনেক দিন ধরেই তিলে তিলে শক্তি অর্জন করতে হয়েছে।

প্রথম এসে বেশ ক'বছর ধরে সে লড়াই করেছে এই বাদাবনে। এর মধ্যে কাঠের ব্যবসা ছাড়াও ভাড়া নৌকা নিয়ে রাতের অন্ধকারে দু'এক ক্ষেপ মালও বর্ডার থেকে এনেছে।

আর রূপলাল ওপার থেকে ওই সঙ্গে একটা পুরনো বিদেশী বন্দুকও কিনেছিল। ওই বন্দুকটাই ছিল তার বল ভরসা।

দু'একবার অন্য দলের লোকরাও তার কারবারে বাধা দিতে চেয়েছিল। রাতের অন্ধকারে আসছে নৌকা নিয়ে।

ছায়ামূর্তির দল আর একটা নৌকা নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করেছে, রূপলালের নৌকার মাঝি সনাতন খুব হুঁসিয়ার ছেলে।

সেও দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে—বিষণের দলের লোক ওরা।

বিষণরা ওকে বাধা দিতে চায়। রূপলালও তৈরি। ওদের নৌকা কাছে আসতে বিষণ হেঁকে ওঠে—নৌকা থামা বে, ভেড়ির বাচ্চা!

আমার এলাকায় উড়ে এসে জুড়ে বসে কারবার করবি?

গর্জে ওঠে বিষণ—দে ব্যাটাকে কুপিয়ে টুটুকরো করে গাঙে ফেলে দে।

রূপলাল এবার জবাব দেয়। তবে কথায় নয়; বন্দুকের গুলিতে। বিষণ জানতো না যে ওর কাছে বন্দুক থাকবে। তাই এগিয়ে এসেছিল সে।

কিন্তু রূপলালের গুলি লেগেছে বিষণের বুকে—এক গুলিতেই শেষ, রূপলাল দেখছে ওদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা। নৌকা ঘুরিয়ে পালাতে যাবে ওরা সর্দারের এই অবস্থা দেখে এবার রূপলাল ওদের নৌকার গায়েই পরপর দুতিনটে গুলি করেছে। গুলির আঘাতে ওদের নৌকার কাঠও ফুটো হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে অসীম গাঙের বুকে বিষণের দলের বেশ কয়েকজনও শেষ হয়ে যায়। দু-তিন জন কোন মতে ভেসে ভেসে চলেছে—তাদের একজনকে কোন জেলে ডিঙিতে তোলে, বাকি দুজনও কোথাও হারিয়ে যায়।

রূপলালের এলেম দেখে সনাতন। তার গুরু নির্বাচন মন্দ হয়নি, তাও বোঝে সে।

এর পর রূপলালের খ্যাতি এই আবাদ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রূপলাল এখন ফাঁকা মাঠ পেয়েছে, এর মধ্যে আরও দু-তিনটে নৌকা করেছে। একটাতে পেট্রল ইঞ্জিন লাগিয়ে স্পিডবোট বানিয়ে এখানে দিনমানে কাঠের মহাজন সেজে থাকে। আর রাতে অন্য ব্যবসাপত্র করে বেশ গেড়ে বসেছে খলসেখালির আবাদে। তখন এখানে গঞ্জ গড়ে ওঠেনি।

একটা ছোট নদীর ওপারেই আদিম অরণ্য।

ভাটার সময় এদিকের গাঙ প্রায় শুকিয়ে যায়—আবার জোয়ারে ভরে ওঠে।

ওদিকের বন থেকে মাঝে মাঝে বাঘও ওই গাঙ পার হয়ে মানুষের বসতিতে চলে আসে। এদের ঘরও তেমন পোক্ত নয়। বেড়ার ঘর অধিকাংশ মাথায় ছনের ছাউনি। ওর একপাশে গরু-মানুষ একত্রে

বাস করে।

রাতের অন্ধকারে একটা বাঘ ক'দিন ধরেই হানা দিচ্ছে এদিকে। তার গর্জনে কেঁপে ওঠে ঘর-বাড়ি।

কোথায় কার চাপা আর্তনাদ ওঠে। কোন ঝুপড়ির বাইরে কে শুয়েছিল তাকেই টেনে নিয়ে যায়, সকালে তার ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

সেদিন হাটতলাতেই হানা দিয়ে একজনকে মেরে যায়।

ওই ছোট বসতে যেন প্রকৃতির ধ্বংসদূত হয়ে এসেছে ওই বাঘটা। একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে এখন মেতে উঠেছে।

আর সাহসও বেড়েছে বাঘটার।

আগে রাতের বেলায় এসে হানা দিত, এখন বাঘটা দিনের বেলাতেও এদিকের কোন ঝোপ-জঙ্গলে থাকে।

সেদিন দিনদুপুরে মাঠে গরু চরাচ্ছিল একটা ছেলে, বাঘটা তাকেই শিকার করে নিয়ে যায়।

সারা এলাকার মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রূপলাল দেখে মানুষের অসহায় অবস্থাটা।

এবার সে দেখছে বাঘটা যেন এখানে তার প্রতিষ্ঠাকেই ব্যাহত করতে চায়। মানুষজন অনেকে এই আবাদ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছে।

রূপলাল সেই রাতে ঘুমোয়নি। সেও বের হয়েছে বন্দুক নিয়ে। বাঘটার সাহসও বেড়েছে। সে এখন লোকালয়ে এসে মানুষের সন্ধান করে।

সেই রাতেও আসছে বাঘটা।

রূপলাল ভেড়ির ধারে একটা কেওড়া গাছের আড়াল থেকে দেখে বাঘটাকে। জোনাকি জ্বলছে তাকে ঘিরে যেন জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত আসছে বাঘটা। সেও টের পেয়েছে রূপলালের অস্তিত্ব।

তাই শিকারের সন্ধান পেয়ে এগিয়ে আসছে।

রূপলাল নড়েনি—সে দেখছে বাঘটকে। কাছে এসেছে—এবার

মাটিতে ল্যাজ ঝাপটে চাপা গর্জন করে লাফ দিতে যাবে আর সেই মুহূর্তেই গুলি করেছে রূপলাল বাঘের দুইচোখের মাঝ বরাবর।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতা খান খান করে রূপলালের বন্দুক গর্জে ওঠে। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বিশাল বাঘটা ছিটকে পড়ে মাটিতে। রূপলাল তার পরের গুলিটাও তার বুকেই গেঁথেছে।

সারা আবাদের মানুষ ওই রাতেই বের হয়ে আসে। আনন্দে উৎফুল্ল তারা। তাদের মহাশত্রুকে নিপাত করেছে ওই রূপলাল।

তাকে ঘাড়ে করে মশাল জ্বেলে নাচ-গান শুরু হয়।

রূপলাল তাদের মদও যোগায়, মাংসও এসে যায়। আর গোবর্ধনের মাছের আড়ত থেকে সেদিন বেশ কিছু মাছও আনে ওরা। কোনমতে ঝলসে পিঁয়াজ নুন তেল কাঁচালঙ্কা দিয়েই মদের উৎকৃষ্ট চাটও হয়ে যায়।

এর পর খলসেখালি গঞ্জে রূপলালের প্রতিষ্ঠাও বেড়ে যায়। রূপলাল এখন বাড়িঘর করেছে। কাঠগোলাও চালু করেছে, ভাবছে করাতকল করার কথা।

এখন এখানে সে ক্রমশ তার প্রতিষ্ঠা কায়েম করে বসেছে। আর সেটাকে আরও মজবুত করতে চায় রূপলাল।

গোবর্ধন বারিক এই ব্যাপারটাকে ঠিক আমল দিতে চায় না।

এদিকের মাছধরার বেশ কিছু নৌকা তারই, জাল-নৌকা এসবের মালিক। সে জেলেদের এক-একটা দলকে জাল-নৌকা এসব ভাড়া দেয় চড়া দরে, তার টাকাও নেয়।

আর সেটা আদায় করার জন্যই নিজেই সব মাছ জেলেদের কাছ থেকে কিনে নেয়। তার জন্য দামও ঠিক দেয় না।

ফলে অসন্তোষও লেগে থাকে জেলেদের মধ্যে। গোবর্ধন বারিকের তাতে কিছুই যায় আসে না। সে তার জগৎ নিয়েই রয়েছে।

গোবর্ধন বারিক এখানের পুরনো বাসিন্দা। ওর পিতৃদেব এখানে এসেছিলো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, তখন এখানে ছিল বান, গরান-

কেওড়ার জঙ্গল। হরিশপুরের জমিদার বক্সীবাবুরা এই লাটের পত্তনি নিয়ে জঙ্গল কাটিয়ে আবাদ বানায়। গোবর্ধনের পিতৃদেব নিরাপদ বারিক তখন ছিল বক্সীবাবুদের গোমস্তা। এখানেই ঘর-বাড়ি, মাছের ভেড়ি করে বসত করে। তার মৃত্যুর পর গোবর্ধন সেই ভেড়িকে আরও বাড়িয়ে মাছের আড়ত খুলে এই এলাকার বেশ কিছু মানুষকে দাদন বাবদ জাল নৌকা দিয়ে গাঙে পাঠায়। তারা মাছ ধরে। সমুদ্রের ছোঁয়ালাগা গাঙ, এখানে তাই সরেস জাতের পারশে, ভেটকি, বাগদা চিংড়ি, ইলিশ সবই ওঠে। গোবর্ধন বারিক নিজের লঞ্চে করে সব মাছ রাতারাতি বসিরহাটে, না-হয় ক্যানিং-এর বাজারে চালান দেয়। আমদানীও ভালোই হয়। তাই গোবর্ধন বেশ ঘটা করে গঙ্গাপূজার উৎসব করে। তার মাছের আড়তের পাশেই ফাঁকা মাঠে প্যাণ্ডেল করে গঙ্গামায়ের মূর্তি আনে বসিরহাট থেকে।

সারা গ্রাম, এই অঞ্চলের দূরদূরান্ত থেকে অনেক মানুষজন আসে, মেলা হয়। দূর আবাদে মানুষের জীবনে কোনো আনন্দের অবকাশই নেই। গোবর্ধন বারিক ক'দিন এই অন্ধকার বনকে আলোয়, কলরবে ভরে তোলে। খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। ঢালাও খিচুড়ি, কুমড়োর তরকারি, আমড়ার টক, তার উপর পায়েস। আবাদের মানুষ গোবর্ধনের জয়জয়কার করে।

সেই উৎসবে রূপলালও আসে। সেও দেখেছে ব্যাপারটা, হঠাৎ করে হাসির শব্দে চাইল রূপলাল। মালোপাড়ার কামিনী।

কামিনীকে এর আগেও দেখেছে রূপলাল।

তখন সেও ব্যস্ত ছিল হয়তো। আর কামিনীও ব্যস্ত। মেয়েটাকে রূপলালের পাবার মত সাহস ছিল না।

তবে কামিনীকে চেনে সে।

বসতির ওদিকে একটু উঁচু জায়গায় জেলেদের বসতি। ওখানে গাছ গাছালি উঁচু জমি কিছু আছে। বর্ষার সময়েও ওখানে জল ওঠে না। ওইখানেই কামিনীদের ঘর। উঠোনে জাল শুকায়। মাছ রাখার বড় ঝুড়িগুলো থেকে বাতাসে আঁশটে গন্ধ ওঠে।

কামিনীর নাম সকলেই জানে।

কবে কোন কালে অজ্ঞানে নাকি তার বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু স্বামী মাছ মারতে গিয়ে গাঙে তলিয়ে যায়। তাতে কামিনীর কিছু যায় আসেনি।

সে বর্ষার সতেজ গাছের মত বেড়ে উঠেছে লকলকিয়ে। সারা দেহে জোয়ারভরা গাঙের উচ্ছলতা।

গোবর্ধন বারিক ওই রূপের নেশাতেই যেন মজে যায়।

এমনিতে সে খুবই হিসেবী মানুষ।

জালের নিচে অদেখা মাছের খবর ও পায়, সেইমত দাদন দেয় জেলেদের। আর তাদের কাছ থেকে নিজের পাওনা গণ্ডা ঠিকমতই বুঝে নেয়। যাকে তাকে সে দাদনও দেয় না।

কিন্তু কামিনীর বেলায় গোবর্ধন বলে।

—তুই আড়ত থেকে মাছ নিয়ে হাটে বেচ কামিনী। অন্যদিন গাঁয়ে ঘুরেও বেচ, তবু কিছু পয়সা পাবি।

কামিনী দেখছে গোবর্ধনকে।

কালো মুশকো চেহারা। সবসময় একটা গামছা ঘাড়ে চাপানো থাকে। লোকে বলে গোবর্ধন ওই গামছা জেলেদের ঘাড়ে লাগিয়ে টাকা আদায় করে।

কামিনী দেখেছে বারিক মশাইয়ের চোখে কিসের আভাস। ওই চাহনি চেনে কামিনী। বহুজনই তাকে ওমনি চাহনিতে চায়। প্রথম প্রথম ওর গায়ে যেন তীরের ফলার মত বিঁধতো ওই চাহনিটা, এখন সয়ে গেছে।

বলে কামিনী—মাছ কেনার টাকা কে দেবে গো?

গোবর্ধন বারিক হাসে। বলে সে

—পরে টাকা বুঝিয়ে দিবি।

—যদি না দিই? কামিনী হালকা সুরে বলে কথাটা!

গোবর্ধন বলে—গামছাটা কেন রাখি জানিস তো? গলায় ফাঁস দিয়ে টাকা আদায় করি।

কামিনী খিলখিলিয়ে হেসে বলে

—গামছা লাগবে না গো, তোমার ফাঁসে এমনিতেই বাঁধা পড়ে গেছি।

গোবর্ধনও খুশি হয়।

এতকাল সে মাছের ব্যবসা করছে। নিজের দিকে চাইবার সময় পায়নি। হাসনাবাদের ওদিকে কোন গাঁয়ে তার বৌ ঘর সংসার ফেলে শেষ আবাদের এই বসতিতে দু-পয়সা রোজগারের ধান্ধাতেই পড়ে আছে।

এবার হাতে কিছু পয়সা এসেছে, এখানে ও একটা ডেরা করেছে, এবার কামিনীকে নিয়ে ও স্বপ্ন দেখে সে।

বলে গোবর্ধন—তাহলে কাল শুভদিন, কাল থেকেই হাটে বসে যা। আমি বসার জায়গাও করে দেব।

কামিনীর সংসারে বুড়ি মা আর ভাই মদন, এ দুজনেই তার পোষ্য। মদন এখন এখানে-ওখানে টুকটাক কাজ করে, আর লেটোর দলে গান গায়।

কামিনী মদনকে নিয়ে হাটতলার দোকানে বসে মাছের পশরা নিয়ে।

এমনিতে বেশ চালু মেয়ে, আর যৌবন-উচ্ছল দেহ—গলার স্বরও ক্রমশ বের হয়, জীবিকার তাগিদে। বলে সে—মদন, হাঁক।

মদনও হাঁকতে থাকে—জ্যান্ত পারশে—চিংড়ি—ভেটকী—

খদ্দেরও আসতে থাকে। আর বেশ কয়েক দিনের মধ্যে এখানের বেশ কিছু খদ্দের তার বাঁধা হয়ে যায়।

মদনও বড় হচ্ছে।

তারও রোজকারের দরকার। কামিনী রোজ দুপুরে বেচা-কেনা সেরে গোবর্ধনের আড়তে যায়। তখন প্রায় দুপুর। গাঙের বুকে ঢেউ ঝিকমিক করে।

গোবর্ধন এসময় একাই থাকে। হিসাবপত্র দেখে।

কামিনীকে দেখে খুশী হয়।

—আয়।

কামিনী তার খুঁট থেকে দলাপাকানো খুচরো পয়সা বের করে বলে—তোমার মাছের দাম কুল্লে বাহান্নটাকা। নাও।

বাকি টাকা ওর।

কামিনী উঠতে যাবে। গোবর্ধন বলে।

—বোস না! এই তো এলি কামিনী।

কামিনী বলে—বসার কি সময় আছে? গে গুষ্টীর পিণ্ডি পাকাতে হবে না?

চলে যায় সে সারা দেহে কি মাতাল ছন্দ তুলে।

গোবর্ধন দেখছে।

দেখার আশ মেটে না। তাই সেদিন সন্ধ্যার মুখে এসে হাজির হয় কামিনীর বাড়িতে। কামিনী সন্ধ্যা দিচ্ছে।

—মালিক!

গোবর্ধন বলে—এদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

কামিনী বসার জন্য মোড়াও দেয়।

—চা খাবেন তো?

গোবর্ধন বলে—চা! তাহলে কর!

গোবর্ধন চা খেতে খেতে বলে

—কামিনী, মদন তো বড় হচ্ছে। বেশ হুঁসিয়ার ছেলে, গায়েও শক্তি আছে। এর তার জালে এভাবে কাজ না করে ওকে বল নিজেই, জাল নৌকা নে মাছ ধরতে যাক। ভালো রোজগার হবে।

বুড়ি শুনছে কথাটা। বুড়িও দেখছে বারিক মশাইকে। তার মত মহাজন যেচে এসেছে তাদের বাড়িতে। কামিনীর দিকে ওর চাহনিটাও দেখেছে বুড়ি। মনে হয় জালে যেন বড় মাছই পড়েছে।

কামিনী বলে—তাতো ভালোই। মদন কি পারবে?

মদন দাওয়ায় বসেছিল। সে এখন ভর জোয়ান। সেও স্বপ্ন দেখে নিজে জাল নৌকা নিয়ে মাছ ধরবে গাঙের। মাছের ঝাঁকের চলন সে চেনে। গাঙ নৌকা বাইতেও তার জুড়ি নেই।

বলে মদন—কেন পারবো না? দেখবি কত মাছ ধরি।

কামিনী বলে—কিন্তু বারিক মশাই, জাল নৌকা—খোরাকির টাকা এসব তো অনেক লাগবে গো। তারপর মাছ তো জলে—মিললে ভালো। না মিললে গেলো। এত টাকা—

গোবর্ধন কামিনীর দিকে চায়।

তার জন্য যা করার করবে সে। তার জাল-নৌকা-টাকা কোনটারই অভাব নেই।

বলে সে—এর জন্য তুমি ভাবছো কেন? ওসব আমিই দেবো। মদন মাছ দিয়ে ওসব টাকা শোধ করবে।

মদনও খুশি। বলে সে

—তাই দেবো মহাজন।

গোবর্ধন বলে—তাহলে কাল আয়। শুভদিন আছে। গঙ্গাপূজা দিয়ে মায়ের নাম করে বনবিবি আর পাঁচপীরের জয় দিয়ে বের হয়ে পড়।

সামনেই পূর্ণিমার গোণ—মাছের ওর জোয়ার আসবে। ছাখ যদি কিছু করতে পারিস।

কামিনী দেখছে লোকটাকে।

রাত হয়েছে। বাতাসে ওঠে মত্ত গাঙের গর্জন। গোবর্ধন বলে, —চলি।

কামিনী ওকে এগিয়ে দিতে আসছে।

তাদের পাড়া থেকে সরু আল-পথটা এসে ভেড়িতে উঠেছে।

এলোমেলো হাওয়া বয়। নির্জন পথ—আকাশের তারার ঝকমকানি গাঙের বুকে প্রতিফলন এনেছে। বাতাসে ওঠে নদীর গর্জন। ওটা সবসময়ই কম বেশি থাকে।

এখন জোয়ার, রাতের নিস্তব্ধতায় ওই গর্জনটা বেড়ে উঠেছে।

কামিনী বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে,

—আর কত ঋণী করবে বারিকমশাই? শুধবো কি করে গো?

গোবর্ধন বারিক বলে—নাহয় তবু একজনের কাছেই ঋণী রইলি।

জীবনে তো অনেক রোজগার করলাম—লাভও করেছি। এক-জায়গায় নাহয় লোকসানই করতে দে।

কামিনী হাসে।

তারার ঝিলিক জাগে ওর চোখে।

—জেনেশুনে লোকসান করবে বারিকমশাই?

গোবর্ধন বারিকের হিসেবী মন আজ কেমন বেহিসেবী হয়ে উঠতে চায়।

কামিনীকে কাছে টেনে নেয়।

দুরন্ত মাতালকরা মেয়েটা যে এতকাল এত লোকের হাত এড়িয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে, আজ ওই গোবর্ধনকে ফেরাতে পারে না।

লোকটা তাদের ছন্নছাড়া সংসারে আশার আলো এনেছে, দুবেলা দুমুঠো নিশ্চিত অন্নের সংস্থান করেছে। বহু উঞ্ছবৃত্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছে তাকে।

কামিনী দেখছে ওই মানুষটাকে।

ওর সব হিসাব নিকাশ যেন বদলে দিয়েছে ওই কামিনী।

কামিনী বলে,—ছাড়ো গো, পথে ঘাটে এসব কি। কেউ দেখলে কামিনীর কিছু এসে যাবে না, তুমি মহাজন, তোমাকে বদনাম দেবে, এ বাপু আমার সইবে না।

গোবর্ধনের হুঁস ফেরে।

বলে সে—কাল দেখা হবে, চলি—মদনকে আসতে বলো কিন্তু।

গোবর্ধন এইভাবেই কামিনীকে কাছে পেয়েছে।

এই আবাদের এত কাজের মধ্যেও ওই কামিনী তার মনকে ভরিয়ে রেখেছে।

রূপলাল এতদিন খেয়াল করে নি, সেও তার নানা ধান্ধায় ব্যস্ত। সেবার বেশ ভালোই আমদানী হয়েছে। রূপলালের মেজাজটা খুশী। মেলার উৎসবে তাই সেও মেতে উঠেছে।

আবাদের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নাই।

শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াইটার জন্য মানুষের দিন কাটে।

রূপলালও দেখেছে এটা।

তাই সেও কয়েকবৎসর আগে কথাটা তোলে।

ওদিকের একটা প্রাচীন বটগাছের নিচে একটা পুরনো শিবমন্দির ছিল, এতকাল তা অনাদৃত হয়েই পড়েছিল। মন্দিরের চারিপাশে ঝুরি নেমেছে।

ভাঙা মন্দিরের শিবলিঙ্গে গঞ্জের মধু ভটচায মাঝে মাঝে ফুল বেলপাতা ত্ন-এক কণা আতপ চাল ছিটিয়ে যায়।

সেই মধু ভটচাযই সেবার রূপলালকে বাবার ফুল দেয় এক সন্ধ্যায়, রূপলাল সেদিন বর্ডার থেকে বেশ কিছু দামী মাল আনে নিরাপদেই। আর লাভও হয় প্রচুর।

বাবার মাহাত্ম্যই বলে বিশ্বাস হয় রূপলালের। সেই থেকে সে রোজ বাবাকে প্রণাম করে একটা সিকি দক্ষিণাও দেয়।

তারপর করাতকল গড়ে উঠলো।

সবই বাবার দয়া। তাই রূপলাল সেবার ঘটা করে বাবার পুজো দিল—আর এদিকের আবাদের মানুষকে বাবার ভোগ, খিচুড়ি—কচু-কুমড়োর ঘ্যাঁট, পায়েসও খাওয়ায়। তার পরের বছরও রূপলাল আরও রোজগার করে। সেবার আরও ধুম হয়। আর লোকজনও আসে। হাটের ওদিকে ছোটখাটো মেলাও বসে।

তারপর থেকে আবাদ অঞ্চলে ওখানে ওই সময় মেলার পত্তনও হলো। এখন সেটার জাঁকজমকও বেড়েছে।

রূপলালের চোখে গোলাপী নেশার আমেজ।

সেই চোখ দিয়ে সেই রাতে কামিনীকে দেখে। কামিনীও এখন ভালো রোজগার করছে। সেজেছে সেদিন কামিনী। গ্যাসের আলোয় কামিনীকে দেখায় যেন পরীর মত, রূপলাল থমকে দাঁড়ায়। ওর-ত্নপা যেন আটকে গেছে। চোখের সামনে কোন রূপবতী এক রহস্যময়ী মেয়ে, চোখে ওর গহিন গাঙের আদিম রহস্যময়তা, সারা দেহে বাঁধ-ভাঙা জোয়ারের মত্ততা।

কামিনীও দেখছে রূপলাল মান্নাকে।

ওই বাদাবনের বাঘের মত কঠিন মানুষের চোখেও সেই আর্তি দেখেছে কামিনী।

কামিনীর কণ্ঠে হালকা সুর। বলে সে

—কি দেখছ গো মান্নামশাই?

—এ্যা। রূপলালের চমক ভাঙে। বলে সে

—তোমাকে! একেবারে পরী সেজেছো গো! এত সেজেগুজে মেলায় এসেছো—

হাসে কামিনী। সেও এমনি দুর্বার পুরুষদের নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। এর তুলনায় গোবর্ধন বারিক অনেক সহজ সরল, যেন কাদামাটির পুতুল, ওকে নিয়ে যা খুশী করা যায়। কিন্তু রূপলাল মান্না সুন্দরী কাঠের পুতুল। ভাঙবে—তবু মচকাবে না। কামিনী বলে—মনের মানুষ খুঁজতে এসেছি গো।

রূপলাল বলে—মিললো তোমার মনের মানুষ?

—খুঁজছি। মনে হয় পেয়ে যাবো।

মান্নামশাই দেখছে ওকে। কঠিন মানুষটা আজ দেখছে কামিনীকে। তার মনে হঠাৎ কি ঝড় তুলেছে ওই মেয়েটি। রূপলাল বলে,—ছাখো, তবে সেই ভাগ্যবানটি কে গো? তোমার মহাজন—গোবর্ধন নয়তো?

কামিনী দেখছে রূপলালকে। হঠাৎ বেপরোয়া মেয়েটা ধারালো ছুরির ফলার মত ঝকঝকিয়ে উঠে বলে

—যদি বলি তুমি!

রূপলাল হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে সে

—তাহলে তো মহা বিপদ গো—

—আমার না তোমার? খিলখিলিয়ে ওঠে কামিনী।

রূপলাল বলে—সেটা ভাবতে হবে, চলি।

কামিনী বলে—জবাব না দিয়েই চললে যে মান্নামশাই?

রূপলাল বলে—সময় হলেই দেব, তবে তোমার মনের খাতায় আমার নামটা লিখে রেখো কিন্তু। আর জানো তো—আমার পাওনা

আমি উসুল করে নিতে জানি, চলি—আবার দেখা হবে।

তখন সন্ধ্যা নামছে। এখানের সন্ধ্যা স্থায়ী হয় বেশ কিছুক্ষণ। সীমাহীন নদীর বিস্তারে দিনান্তের শেষ আলোটুকুর রং বদলাতে থাকে। গেরুয়া থেকে বেগুনী হয়ে ওঠে। ওপারের বনে বনে জাগে পাখিদের কলরব। বেগুনী রং ছড়িয়ে পড়ে নদীর বিস্তারে, বনের মাথায়, আকাশে আকাশে। ক্রমশ বিষন্ন আলোটা ম্লান হতে হতে ফিকে হয়ে আসে। তারপর গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায় সীমাহীন নদীর বিস্তার, ওই অরণ্যসীমা। সব কালো কালিতে যেন ঢেকে যায়। আকাশের বুকে একটা দুটো করে তারাগুলো জেগে ওঠে। বাতাসের সুর বদলে যায়।

ওদিকে গোবর্ধনের মাছের আড়তে নৌকাগুলো আসছে। সন্ধ্যার পর ওই জায়গাটা জমজমাট হয়ে ওঠে। হেজাকের আলোয় দেখা যায় রাশি রাশি মাছ আসছে, ওজন হচ্ছে কাঁটায়। একজন হেঁকে হেঁকে ওজনটা বলে যাচ্ছে। একজন খাতায় লিখছে সেই হিসেব।

—এখানে? মহাজন!

রূপলাল চাইল কামিনীর দিকে। মাতাল হাওয়ায় কামিনীর গায়ের কাপড়টা উড়ছে, দেখা যাচ্ছে তার কানায় কানায় ভরা দেহের কিছুটা। চোখে কি নীরব আহ্বান! এ যেন সমুদ্রের ডাকে মাতাল অবস্থা গাঙের।

রূপলাল বলে, তোমার মহাজন তো আমি নই গো—

মেয়েটা দেখছে ওকে। বলে, টাকা দাদন দিলেই মহাজন হয় না গো। টাকা তো অনেকেরই আছে সোনসারে।

তবে? রূপলাল শুধোয় কামিনীকে।

কামিনী বলে, মনই তো আসল মহাজন গো। সে চাইলে অনেক কিছুই পায়। তবে চাইতে জানতে হয়।

মেয়েটার কথার সুরে যেন একটা আবেগ ফুটে ওঠে। রূপলাল দেখছে মেয়েটাকে। আলো-আঁধারির জগৎ, গাঙেরর জলে তারার

আলো প্রতিভাত হয়। ওই বিচ্ছুরিত আলোয় দেখছে রূপলাল মেয়েটিকে। কামিনী বলে, তুমি মহাজন এ জেবনে চাইলে শুধু ট্যাকা আর ট্যাকা—চলি গো। আড়তে না গেলে বুড়ো ভাম আবার কাঁটায় মেরে দেবে। তু-দণ্ড দাঁইড়ে মনের কথা বলার সাবকাশও নাই।

চলে যায় মেয়েটা ঢেউ তুলে। রূপলালের বুকে ওই ঢেউ এসে লাগলো।

ইদানীং রূপলাল এই অঞ্চলের মান্যগণ্য ব্যক্তি। এবার পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছে। তার ওপর অনেকেরই নজর রয়েছে। ফরেস্ট, সেচ দপ্তর, পুলিশের কর্তারা এখানে এলে রূপলালের বাড়ির লাগোয়া তার নতুন অতিথি-নিবাসে এসে ওঠেন। রূপলালের নিজের লঞ্চ ছোটে দূরের বসিরহাট শহরে; বরফ, বিলাতী মদ, সন্দেশ, কাজু, ভালো বিস্কুট, আনাজপত্র, এটা-সেটা আনা হয় মাননীয় অতিথিদের জন্য। জেলার মাথারা তার হাতধরা, এহেন রূপলাল একটা মেয়ের জন্য প্রকাশ্যে কোনো গোলমাল বাধাতে চায় না। কৌশলেই কাজ সারার লোক সে।

রূপলাল দেখেছে অনেক রাতে আড়তের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর নদীর ধারে নির্জন চালায় বসে আছে ওই কামিনী আর গোবর্ধন। ভালো আমদানী হলে গোবর্ধন একটা পাঁইট বোতল নিয়ে বসে, কামিনীকেও থাকতে হয়।

রূপলাল দেখেছে রাত গভীরে নদীর ধারে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা। একদিন তাই শুধোয় রূপলাল, তোমার মহাজন কেমন আছে গো?

হাসে কামিনী, জোয়ারের ছিটকে-ওঠা জলের মত উচ্ছল সেই হাসি ওর আধ-আদুড় গায়ে কাঁপন আনে রূপলালের মনে। কামিনী বলে,

আমার মহাজন তো এখনও পাইনি গো। দেনদার হয়েই রইলাম। আর বারিকমশায়ের কতা বলছো? ও তো স্রেফ পাওনাদার গো।

মহাজন নয়, মহাযম ! চলি গো—

চলে যায় মেয়েটা। ছন্দ-মেলানো পায়ে ভেড়ির সরু পথ ধরে, গাঙের ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে ওর আঁচল, কোনোদিকে ওর নজর নেই। বহতা নদীর মতোই আপন ছন্দে চলেছে কামিনী। রূপলালের মনে কালবৈশাখীর ঝড় আসে। সবকিছুকে আপন করে পাবার হকদার সে।

রাগ হয় গোবর্ধন বারিকের ওপর। সে-ই তো আটকে রেখেছে অদৃশ্য বাঁধনে ওই কামিনীকে। এক-একবার ভাবে, রাতের অন্ধকারে মেয়েটাকে জোর করে লঞ্চে তুলে নিয়ে উধাও হবে। এসব কাজ তার বাওয়ালি খালাসীদের কাছে এমন কোন কঠিন কাজই নয়।

রূপলাল এর আগেও তার লোকদের দিয়ে বেশ কিছু কাঠ-মহাজনের নৌকাবোঝাই কাঠ লুট করিয়েছে। তার লোকরাই যে এদিকের গাঙে এমন ডাকাতি করে তা জানে রূপলাল। শুধু কোনো চোরাকারবারীর নৌকা যাতে না লুঠ করে সে সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হয়। কারণ অদৃশ্য সেই রাতের কারবারীরা রূপলালকে রাজমান্য হিসাবে মাসে একটা ভালো টাকাই দেয়। তার কিছুটা আবার রূপলাল তার ওই অন্ধকারের বাহিনীকেও দেয়। তবু রূপলাল হুঁশিয়ার লোক। মশা মারার জন্য কামান দাগতে সে চায় না।

কামিনীকে সেদিন একটা দামী শাড়ি দেয় রূপলাল। শাড়িটা দেখে কামিনী বলে, এ যে বিলাইতি গো, অনেক দাম !

রূপলাল বলে, তোমার দামই কি কম গো ; তোমার মহাজন—

চোখে মাতন তুলে কামিনী বলে, পথের কাঁটা গো। বিগড়ে গেলে জাল, নৌকা ধরে নে যাবে।

—কত টাকা দাদন নিয়েছো ? রূপলাল শুধোয়।

মেয়েটা চাইল ওর দিকে, মালোর মেয়ে, মাছ-ব্যবসা ছাড়ি কি করে গো ? তুমি যে কাঠ মহাজন হয়েই রইলা—

মেয়েটা চলে যায়। রূপলাল ভাবছে এবার নতুন করে। মাছের ব্যবসাও আগে করেছিল সে, তখন লঞ্চ ছিল না। নৌকায় মাছ চালান দিতে হতো। মাছ পচে গিয়ে বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে কাঠের

ব্যবসাতে এসেছিল রূপলাল। কাঠ তো পচবে না—তাই কাঠ নিয়েই পসরা শুরু করে আজ এখানে পৌঁছেছে।

কথাটা রূপলালের মনে দাগ কেটে বসে। দেখছে রূপলাল ওদিকে গোবর্ধন বারিক তার আড়তের সামনে মাছ ওজন করাচ্ছে। রাশি রাশি ভেটকী, পারসে, সিলেট, ভালো সাইজের পমফ্রেট মায় বাগদা চিংড়ি অবধি আছে।

দুনম্বরী বাটখারা দিয়েও ওজন মারে। আর এখন পমফ্রেট বাগদা চিংড়ি তো সোনার দর। বিদেশে চালান যায়।

ব্যাটা জলের দরে কিনে সোনার দরে বেচে, অথচ জেলেদের দুদিক থেকেই মারে।

কে চীৎকার করে—খুব ঠকাও, আর তোমাকে মাছ দেব না। গোবর্ধন তাকে গামছা দিয়ে ঘাড় ধরে গর্জায়।

দিবি না মানে? তোর বাপের নৌকা—জাল?

কামিনীও দেখছে।

সে বলে—কি করছো মহাজন! মারবে নাকি গুপীকে?

গোবর্ধন গর্জে ওঠে—তুই এর মধ্যে কথা বলিস না কামিনী!

কামিনী বলে—কেন বলবনা? অন্যায় করবে।

ফুঁসে ওঠে গোবর্ধন।

—ওই গুপী কি তোর পিরীতের নাগর যে দরদে উথলে উঠছিস? শালা বেইমান—ওর সঙ্গে তোর কি?

কামিনীও ছাড়ার পাত্র নয়, সেও ফুঁসে ওঠে—আমিও তোমার সাতপাকের মাগ লই, কার সঙ্গে কি আছে তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

গোবর্ধন চমকে ওঠে।

কামিনী চলে যায়। গোবর্ধন আবার হৃত উদ্যম নিয়ে জেলেদের হিসাবের টাকা আদায় করতে থাকে।

দৃশ্যটা দেখেছে রূপলালও। দেখেছে কামিনীর তেজ, মেয়েটা

বিজলীর মত চমকে উঠতে জানে। আর তখন রূপও যেন ঝলসে পড়ে।

রূপলাল ভাবছে সে ওই মাছের ব্যবসা শুরু করবে।

যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে, এখানে মাছের ব্যবসার লোকসান এখনো পূরণ করতে পারেনি। অবশ্য তার অনেক শতগুণ সে রোজগার করেছে। তবু মাছের ব্যবসা আবার করবে। এখন তার নিজের সঙ্গতি আছে। এখানের মাছ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারবে। বিদেশে যারা চালান দিচ্ছে মাছ তাদেরই দেবে।

লাভও হবে। আরও আলাদা লাভ হবে কামিনীকে হাতে পাবে। জানে রূপলাল ওই মোটকা গোবর্ধন বারিক মুফতে অমন সরেশ মেয়েটাকে হাতে পেয়েছে।

রূপলালের মনে ঝড় তুলেছে মেয়েটা। রূপলাল জানে ওই কামিনীকে তাকে পেতেই হবে। সে যা চায়,—তা পায়, বাদাবনের এই এলাকার সবকিছু সেরা জিনিসে তারই অধিকার কায়েম করতে হবে।

তাই মাছের ব্যবসা করার কথাও ভাবছে রূপলাল। ওই কামিনীকে দিয়েই আড়ত চালাবে। কিন্তু গোবর্ধন বারিক এতকাল এখানে ওই ব্যবসা করছে, আটঘাট ও জানে। সব জেলেরা তার হাতে, তবু ওই লোকটার হাত থেকে কামিনীকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে।

কথাটা সনাতনকেও বলে রূপলাল। সনাতন তার ব্যবসার এদিক-ওদিক সবই দেখে, দুর্জয় সাহস তার। দরকার হলে খুন খারাপিও করতে পারে ঠাণ্ডা মাথায়।

বেশ কিছু এমন কাজ করেছে সনাতন। সনাতনও ওই মাছের ব্যবসার কথা শুনে বলে, আজকাল মাছেও প্রচুর লাভ। বড় করে জমিয়ে করতে পারলে লাখ টাকা আমদানী হয়।

রূপলালও ভাবছে।

সনাতন বলে, কিছু টাকা লাগান—

সনাতন জানে ব্যবসা বাড়াতে পারলে আয়ও বাড়বে। তার আমদানীও হবে। আর বেশ কিছু লোক তাদের হাতে আসবে।

রূপলালও ভাবছে কথাটা।

এর কয়েকদিন পরই মেলার ধুমধাম শুরু হয়। বনবিবির পালা-গান, বাবা দক্ষিণারায়ের পাঁচালী, কবির আসর—ঝুমুর এসবও হয়। সেই মেলাতেই সে রাতে ওই কামিনীকে দেখেছিল রূপলাল। গোবর্ধন বারিকের দেওয়া নতুন শাড়িতে সেজেছে মেয়েটা। ক'দিন আড়ত বন্ধ, রাতেও খানা-পিনা হয় এখানে।

কামিনী বলে, ভালো লাগে না গো! লোকটা সত্যি মহাযম হয়ে উঠেছে। শ্যাল-শকুনির মতো খাবলে খেতে চায়। মরণ। আর মরা ছাড়া বাঁচার পথও তো নাই গো। এই যে দেখছো রোশনী, বাদ্যি-বাজনা—এর পিছনে শুধুই আঁধার গো, শুধুই আঁধার।

রূপলাল বলে, যদি বাঁচাতে চাই?

মেয়েটা চাইল। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, পারবে বাঁচাতে মহাজন?

—দেখা যাক পারি কিনা।

রূপলালের সেই জেদটা চেপে যায় এবার। জেদ চাপলে রূপলাল সবকিছুই করতে পারে। তখন তার অসাধ্য কিছুই থাকে না।

গোবর্ধন সেদিন আড়তে যাচ্ছে, পথের ধারে রূপলালকে দেখে চাইল। রোদও বেড়েছে, ঘামছে মোটা-সোটা গোবর্ধন। গামছাটা দিয়ে মাঝে মাঝে ঘাম মুছছে। রূপলালের রোদবৃষ্টি সহ্য করা অভ্যাস আছে। নিপাট কঠিন স্বাস্থ্য তার। রূপলাল বলে, বারিকমশাই, এই রোদে আর আড়তে কেন যাচ্ছেন?

—ব্যবসা—মা লক্ষ্মীর আটন, গোবর্ধন জবাব দেয়।

বলে রূপলাল, কত পেলে ওই ব্যবসা বিক্রি করে দেবে?

চাইল গোবর্ধন। কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাসই করতে পারে না।

রূপলাল বলে, কত চাই?

এবার গোবর্ধন বারিক শুনেছে কথাটা, বলে সে,

—বাপুত্তি ব্যবসা। তোমার মতো উড়ে এসে বাদাবনে জুড়ে বসিনি

রূপলাল। এখানের জঙ্গল কেটে আমার বসত। আমাকে হঠাতে যেওনা—তোমাকেই হঠতে হবে।

—তাই নাকি? অ্যাঁ? হাসছে রূপলাল। রাগলেও ওর মুখ-চোখে রাগ ফোটে না। রূপলাল বলে, কথাটা শুনলে ভালো করতে, ভালো দামই দিতাম।

চলে যায় রূপলাল। গোবর্ধন বারিক ভেড়িতে দাঁড়িয়েই শাসায়, —টাকার গরম হয়েচে, না? শালো, আমাকে টাকার গরম দেখাতে এসো না! হ্যাঁ!

অবশ্য ব্যাপারটা দেখেছিল একজন আড়াল থেকে, সে ওই কামিনী। ভরদুপুরে ক্ষেত থেকে খাবার দিয়ে ফিরছে, হঠাৎ ঝোপের ওদিকে ভেড়িতে দুই মূর্তিকে মুখোমুখি দেখে থমকে দাঁড়ায় মেয়েটা। বেশ জানে সে, রূপলালের মধ্যে একটা নতুন সত্তাকে সে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু সে যে এত তাড়াতাড়ি এমন লোভী, দুঃসাহসী হয়ে উঠবে তা ভাবতেও পারেনি। আজ নিজের কানে শুনেছে কামিনী রূপলাল ওই মাছের আড়তই কিনে নিতে চায়। কিন্তু গোবর্ধনও ছাড়বে না, সেটা জানিয়ে দিয়েছে। চলে গেছে দুজনে দুদিকে। কামিনী তখনও কেওড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে।

রূপলালকে নিয়ে একটু খেলতে চেয়েছিল কামিনী। পুরুষের বুকে ঝড় তুলে তার মাতন দেখতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু রূপলাল লোকটা যে এমন সাংঘাতিক ধরনের তা বোঝেনি। তার জন্য ওই ব্যবসাই কিনে নিজের দাপট দেখাতে চায় রূপলাল। দেখাতে চায় তার প্রতিষ্ঠা! ভয় পায় কামিনী। এই ধরনের পুরুষরা ভালোবাসতে জানে না, জানে নিজের দখল নিতে। সেই মানুষটার মনেই ঝড় তুলেছে কামিনী! বোধহয় মস্ত ভুলই করে বসেছে সে!

পরদিনই দেখা হয় রূপলালের সঙ্গে। লোকটা এগিয়ে এসে বলে, —তুমি তৈরি থেকো কামিনী, মাছের ব্যবসাই করবো। তুমিই দেখ-ভাল করবে সবকিছুর।

—ওমা ! আমি মুরুক্ষু মেয়েছেলে !

রূপলাল বলে, ব্যবসা করতে লেখাপড়া জানা লাগে না, লাগে পাটোয়ারী বুদ্ধি। তা তোমার আছে গো। এবার তোমাকে নিয়েই নেমে পড়ি।

রূপলালের সাহস ক্রমশ বাড়ছে। আজ সে কামিনীর গায়ে কঠিন হাতখানা রেখে কথা বলে। ওই কাঠের মতো শক্ত হাতটা যেন কামিনীর দেহে সাঁড়াশির মতো চেপে বসে। কামিনীর মতো বহু-বল্লভারও ভয় হয়।

কামিনী সেদিন ঠিক বোঝেনি রূপলালকে। ও যে কত জেদী তা বুঝেছে ওর কথায়। কামিনীকে পাবার জন্যই রূপলাল মাছের ব্যবসা চালু করবে। আর সংঘাত বাধবে।

আর সংঘাত বাধবে ওই গোবর্ধন বারিকের সঙ্গেও, গোবর্ধনও কামিনীকে হারাতে চাইবে না, তার এতদিনের ব্যবসাও ছাড়বে না।

রূপলাল তার তুলনায় অনেক কঠিন প্রকৃতির মানুষ, না হলে এখানে নিঃস্ব হয়ে এসে এতকিছু গড়তে পারত না। তাকে দেখেছে সেবার মানুষ খেকো বাঘটাকে মারতে। সে বাঘের চেয়েও হিংস্র।

কামিনীর ভয় হয়, সে ভুল করে ওই লোকটার মনে খেলার ছলে ঝড়ই তুলেছে। এখন সেই সর্বনাশা ঝড়ে তারও সব কিছু মুছে না যায়।

গোবর্ধন বারিক অনেক ঠাণ্ডা মানুষ।

রূপলাল তার কি সর্বনাশ করবে কে জানে, এসবের মূলে সে নিজে, কথাটা ভাবতেও ভয় হয় কামিনীর। রূপলালকে এড়াতেই হবে। কিন্তু কিভাবে তা জানে না, ভাবনায় পড়ে সে।

এমনি দিনে হঠাৎ রতনকে আসতে দেখে অবাক হয়। কামিনীদের দূর সম্পর্কের কেমন আত্মীয়। বলিষ্ঠ তরুণ, কামিনী একবার যোগেশ কাঠিতে তার মাসীর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিল রতনকে। তখন ও হাসনাবাদে কোন লঞ্চ কোম্পানীতে সবে সুখানি হয়ে ঢুকেছে।

মাসীর বাড়িতে সেও এসেছিল একটা বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে তার মাকে নিয়ে। কামিনী তখন সগুযৌবনা। কবে বিয়ে হয়ে স্বামী মারা গেছে জানেনা। তবে সমাজ তাকে বিয়ের কথা আর শোনায় না। তবু কামিনীর সগুজাগর কুমারী মনে একটা স্বপ্ন জাগে ওই রতনকে ঘিরে।

ক'দিন সেখানে ছিল। দুজনে গাঙের ধারে বেড়াতে আসতো। ভোড়তে পুরোনো বিরাট শিরীষগাছে ফুলের বাহার। বাতাসে তার মৃদু গন্ধ।

রতন বলতো—শুখানি থেকে সারেং হতেই হবে।

—তারপর? কামিনী কি স্বপ্ন দেখতো। রতন তারপরের কথাটা বলতে পারেনি।

তার চোখে ফুটে উঠেছিল ব্যাকুল মিনতি। বলে রতন,

—আবার দেখা হবে কামিনী। কালই যেতে হবে। কামিনীর হাতখানা ওর হাতে। কামিনী বলে,

—তোমার পথ চেয়েই থাকবো।

কামিনী ফিরে এসেছিল আবার এই খলসেখালিতে। জীবনের লড়াইয়ে সামিল হয়ে গেছল। দেখেছে মোটকা গোবর্ধন বারিকের চাহনি, দেখছে হিংস্র রূপলাল মনের লালসা। তাকে নিয়ে দুজনের ঠাণ্ডা লড়াইও শুরু হয়েছে। তবু এসবের মাঝে মনে পড়ে রতনের কথা।

তার চাহনিতে লালসা ছিল না। ছিল মুগ্ধ এক বিস্ময়। প্রেমের স্পর্শ যেটুকু সেই কদিনেই পেয়েছিল কামিনী, যার স্বাদ এই মানুষগুলো কোনদিন দিতে পারবেনা।

এরা চায় লুটে নিতে—আর রতন চেয়েছিল নিজেকে সমর্পণ করে দিতে

হঠাৎ দীর্ঘদিন পর রতন এসেছে খলসেখালিতে। অবাক হয় কামিনী। বসিরহাট ধুইজালির ফেরী লঞ্চটাকে এদিকে আসতে দেখে। লঞ্চটা এসে ঘাটে ভেড়ে। উপরের কাঁচ ঘেরা সারেঙের ঘর। কামিনী হঠাৎ দেখে সেখান থেকে বের হচ্ছে রতন। পরণে প্যান্ট-সার্ট।

চমকে ওঠে কামিনী।

—রতনদা।

রতন নেমে আসে। বলে সে—এখন বসিরহাট-পুইজালি ফেরী লঞ্চের সারেঙ হইছি। আজ সময় পেলাম, চলে এলাম তোমাদের খবর নিতে।

কামিনী যেন হাতে স্বর্গ পায়।

বলে সে, কি ভাগ্যি আমার। চলো বাড়িতে।

রতন বলে, বেশি সময় নেই। সন্ধার মুখেই ফিরতে হবে পুই-জালিতে। কাল ভোর চারটেতে সার্ভিস।

কামিনী বলে, পুইজালি এমন কিছু দূর নয়। লঞ্চে তো আধঘণ্টার পথ। কতদিন পর এলে, বাড়ি চল।

ভাইকে বলে কামিনী—মদন, হাটতলা থেকে গরম সিঙ্গাড়া-মিষ্টি কিছু নিয়ে আয়।

সেদিন বৈকালটা কামিনীর কি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কেটে যায়।

—আজ রতনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। রতন বলে,

—চল না, বাদাবনেই পড়ে আছো, কিছুদিন বসিরহাট ঘুরে আসবে। আমার বাসা তো খালিই পড়ে আছে।

কামিনী বলে, তোমার সাহস তো মন্দ নয়?

—কেন?

—একটা সোমত্ত মেয়েকে নে গিয়ে খালি বাসায় তুলবে? লোকে জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?

রতন এটা ভাবেনি।

—তাই তো!

—তাই তো! তবু তো আপনজন, চলো—।

কামিনী বলে, তোমার ভরসায় কূল ছেড়ে অকূলে ভাসবো?

রতনও স্বপ্ন দেখে কামিনীকে কেন্দ্র করে, তাকে সেও ভোলেনি, তাই এসেছে এতদিন পরেও। বলে রতন,

—যদি সেখানে কূল পাও!

কামিনী জানে সমাজ তাকে বিধবা বলেই জানে যদিও স্বামীর কোন স্পর্শই সে পায়নি।

বলে কামিনী—জানো তো আমার পোড়া বরাতের কথা।

রতন সহরে বাস করে। অনেক উদার। তাই বলে সে,

—সব জেনেশুনেই এই কথা বলছি কামিনী। কথাটার জবাব এখুনিই চাইছি না। তুমি ভেবে ছাখো। আমার দরজা তোমার জন্য খোলাই থাকবে।

সন্ধ্যা নামছে। রতন বলে, আজ চলি। পরে কোনদিন আসবো। তখনই জবাব দিও। তবে আমার কথাটা জানিয়ে গেলাম—তুমি এলে আমার শূন্য ঘর ভরে উঠবে।

কামিনী আজ জীবনে নতুন করে কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে, সে এখান থেকে এই হিংস্র পরিবেশ থেকে চলেই যাবে।

রূপলাল মান্না একটা এমন জাতের লোক—যারা জীবনে মরতেও প্রস্তুত তবু এক ইঞ্চি দখল ছাড়বে না। সে ওই গোবর্ধন বারিকের আড়ত কিনে নিতে চেয়েছিল, কামিনীর উপর যেন গোবর্ধন আর নজর দিতে না পারে, এখান থেকে চলে যেতে হয় তাকে।

কিন্তু গোবর্ধন বারিকও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও কঠিন ভাষায় রূপলালকে প্রত্যাখান করেছে। জানিয়েছে এই বাদাবনে তারও অধিকার আছে থাকার, ব্যবসা করার, কামিনীকে দখল করার।

সেদিন রূপলাল কোন জবাব না দিয়েই ফিরে এসেছিল। কিন্তু মনে মনে গজরাচ্ছিল আহত বাঘের মতই।

সনাতন এসব বিষয়ে খুবই অভিজ্ঞ, সে সব শুনেছে। বলে সনাতন,

—এর জন্য এত ভাবছেন কেন? গোবর্ধন তো নাস্যি—

কি করবি? রূপলাল শুধোয়।

সনাতন বলে—ওকে শেষ করে দিচ্ছি।

ও শেষ—মানে? শেষে আবার খুন খারাবি করবি?

রূপলালের কথায় হাসে সনাতন। বলে,—না—না। কাকপক্ষীতেও টের পাবেনা। গোবর্ধন ফৌত হয়ে যাবে।

তারপরই সনাতন প্ল্যানটা জানায় রূপলালকে।

রূপলাল শুনে বলে খুশি ভরে…নাহ্। তোর মাথাটা সোনায় বাঁধিয়ে রেখে দেবো।

সনাতন বলে, দেখবে ওই মাছের আড়ত—মায় চামেলী সাব পাকা আমের মত ডাল থেকে খসে টুপ করে তোমার হাতেই পড়বে। কাক পক্ষীতেও টের পাবেনা।

রূপলাল বলে, তোকেও খুশি করে দোব। তাহলে শুভ কাজটা সেরে ফেল।

বর্ষা তখনও নামেনি, তবে দখিনা বায়ু শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের সব নদী সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণে নামছে. জোয়ার বয়ে চলে উত্তরের দিকে। তখন দখিনা বাতাস পিঠেনে মারে, ফলে গাঙ বেশ ফুলেফেঁপে ওঠে, আর ভাটার সময় জল নামে দক্ষিণে—বাতাস বয় দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তখন বাতাসের বেগে নদীর ধাবমান স্রোত ফুঁসে ওঠে। নদী তখন মারমুখী হয়ে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গোবর্ধন বারিক তার ডিঙি নিয়ে তরসা নদীর ওপারের গঞ্জ থেকে মাছের গস্ত করে ফিরছে, হঠাৎ নৌকাটার তলা ফুটো হয়ে ওঠে। একটা তক্তা যেন খুলেই যায় জলের চাপে। ফিনকি দিয়ে জল উঠছে, মাঝ গাঙে তখন ডিঙি। মাঝি নকু পাল অবাক হয়, এডা কি করে হয়!

চমকে ওঠে গোবর্ধন। ভারি মোটাসোটা মানুষ সে। ভীত কণ্ঠে বলে, এ কি সর্বনাশ হলো নকু? পাটাতন খসে গেল? নজরেই পড়েনি? কি হবে?

নকু এদিক-ওদিক চায় মাত্র। শুধু জল আর জল। ভাটির টান-ধরা গাঙ, সমুদ্রের দিকে চলেছে জলরাশি।

ধারে-পাশে কোনো নৌকাও নেই। দূর দিগন্তে দেখা যায় তাদের গ্রামসীমা। কিন্তু সেখানে আর এ জীবনে পৌছানো যাবে না। ফিনকি দিয়ে জল উঠছে, টিনের থালাটা দিয়ে গোবর্ধন জল ছিঁচছে। কিন্তু এক গুণ জল ফেলে তো দেখতে দেখতে তিন গুণ জল জমে ওঠে নৌকার

খোলে। পা ডুবে গেছে; হাত কাঁপছে। নৌকাটাও ভারি হয়ে ওঠে, আর টানা যায় না।

নকু বলে, কত্তা, নৌকা তলাইয়া যাইব লাফ মারেন গাঙে। নকু লাফ মেরেছে। পাকা মাঝি সে। ছেলেবেলা থেকেই এই গাঙের মর্জি-মেজাজ বোঝে। ঢেউ-এর মাথায় ভেসে চলে, যদি তীরের সন্ধান মেলে, আর কুমীর-কামটে না ধরে!

ওদিকে গোবর্ধন বারিক জলে পড়েছে। ঠাণ্ডা জল আর তেমনি উথাল-পাথাল স্রোত। কয়েকবার নাকানি-চোবানি খেয়ে গোবর্ধন তলিয়ে গেল।

নকু হাঁক পাড়ে, মালিক—মালিক!

আর কোনো সাড়া মেলে না। নকু অবশ্য বরাতজোরে বেঁচে গেছল। একটা পিটেল বোট এসে পড়ে মাঝ গাঙ থেকে অর্ধ-অচেতন নকুকে তোলে। তারপর খবরটা গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

গোবর্ধন বারিক মারা যাবার খবর পৌঁছে যায় খলসেখালিতে। এখানে গাঙে ডুবে, না হয় বাঘের থাবায়, না হয় কুমীর-কামটের মুখে বহু মানুষই মারা যায়। সুতরাং গোবর্ধনের মৃত্যুও নতুন কিছু নয়। তবু নকু ভুলতে পারে না তাদের নৌকাডুবির কারণটা। নৌকার তলে কেউ তাক বুঝে ঘা মেরে তক্তার জোড়কে ফাঁসিয়ে রেখেছিল নির্ঘাৎ, না হলে এভাবে নৌকা ডোবে না।

খবরটা পেয়ে রূপলালও গঞ্জের ওই গোবর্ধনের বাড়িতে গেছল। ওর লঞ্চ নিয়ে লোকজন নদীর ভাটিতেও খোঁজ করেছিল, কিন্তু গোবর্ধনের কোনো পাত্তাই মেলেনি। ওর মৃতদেহটা বিকৃত, খোবলানো অবস্থায় ভেসে উঠেছিল সাহেবখালির ওদিকে।

রূপলাল অবশ্য ব্যবসায়ী লোক। সে ব্যবসা বোঝে। এবার কাগজ-কলমে দেখা যায় গোবর্ধন রূপলালের টাকা নিয়েই মাছের আড়ত চালাত, আর বেশ কিছু টাকা দেনা রয়ে গেছে এখনও গোবর্ধনের রূপলালের কাছে।

রূপলাল গোবর্ধনের ওয়ারিশান তার ভাইপো ধরণীকে বলে, সাড়ে সাতহাজার টাকা দিয়ে আড়ত নাও, চালাও। না হলে আমাকেই আড়তের দখল নিতে হবে ধরণী।

ধরণী, তার আড়তের অনেকেই রয়েছে। এসেছে কামিনীও। কামিনী গোবর্ধনের অনেক খবর জানে, কিন্তু সে যে রূপলালের কাছে টাকা নিয়েছে তা ভাবতেও পারে না। দুজনের ছিল একেবারে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

কামিনী বলে, মহাজন তোমার কাছে টাকা নে ছিল?

রূপলাল দেখছে কামিনীকে। ওই মেয়েটার জন্যই এত করেছে, আজ তাকেই এ কথা বলতে শুনে বলে রূপলাল,

আমার খাতাপত্র কি মিথ্যা? দ্যাখো, দ্যাখো হে পঞ্চজনে। দরকার হয় আদালতেই যাবো, সেখানেই এর মীমাংসা হবে।

ধরণী বলে, তার দরকার হবে না। ওসব কাজ আমরাই করে নেবো।

রূপলাল বলে, তাহলে তো ভালোই। অবশ্য তোমাকেও কিছু দেবো, ঠকাবো না, ঠকানোর কারবারে আমি নেই।

আড়ত এবার চলে গেল রূপলালের দখলে।

সেদিন সন্ধ্যা নেমেছে। এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। তারার রোশনি ফুটে ওঠে। গাঙে বোধহয় জোয়ার এসেছে, কলকল শব্দ ওঠে। কামিনী ক'দিন মাছের আড়তে যায়নি। ভাবতেই পারেনি যে ওই রূপলাল সত্যিই আড়তের দখল নেবার জন্য এত বড় সর্বনাশ ঘটাবে। বেশ বুঝেছে কামিনী। গোবর্ধনের নৌকা ডোবেনি, তাকে কৌশলে ডোবানো হয়েছে ওইভাবে। রূপলাল যে বাদাবনের বাঘের মতোই লোভী আর হিংস্র তা জানতো না কামিনী। সেই স্বরূপের খবর জেনে শিউরে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময়। বাড়িতে কেউ নেই। ভাই বাজারে। একাই ঘরে রয়েছে কামিনী, হঠাৎ দরজার বেড়াটা ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে চাইল কামিনী। এসেছে রূপলাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওর দুচোখ যেন জ্বলছে

লোভি ধূর্ত শিয়ালের চোখের মতোই।

তুমি!

হাসছে রূপলাল,

এবার তোমার মহাজন হলাম কামিনী। গোবর্ধন তো ফৌত! এবার আড়ত তোমার জন্যই নিয়েছি। তবে জানো তো আমি দাম নিই সব কিছুর।

কামিনী বলে, আড়ত নেবার মতো টাকা আমার নাই।

—টাকা চাই না কামিনী, চাই তোমাকে। তাহলেই সব তোমার!

লোকটা এগিয়ে আসে। অতর্কিতে শক্ত কাঠের মতো ঠাণ্ডা হাত দিয়ে কাছে টেনে নিতে চায় কামিনীকে।

কামিনী বলে,

এত উতলা হলে চলে মহাজন? জোর করে ফুল ফোটানো যায় না! ফুল সময় হলেই ফোটে। ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।

রূপলাল ছেড়ে দেয় কামিনীকে। ওর বুকে যেন ঝড়ের মাতন উঠেছে। বলে রূপলাল,

—কাল থেকেই ওসব দেখেশুনে নাও, আর সন্ধ্যার পর আমার বাড়িতে হিসাব-কিতাব বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। রাতে ওখানেই খাবে কাল থেকে।

—এতো তাড়া কিসের গা?

রূপলাল বলে, কাজ যেটা ধরি, সেটা শেষ করতে ছাড়ি না। কাল থেকেই শুরু। আমার কথাটা মনে রেখো।

—না হলে? কামিনী দেখছে লোকটাকে।

রূপলাল বলে, আমার কথার অবাধ্য হলে তার সাজা আমি দিই।

—তাহলে গোবর্ধন বারিককে তুমিই সাজা দিয়েছিলে?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে রূপলালের চোখ দুটো। নকুকে অবশ্য রূপলাল তার কাঠগোলায় চাকরি দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে। বাকি আছে এই ধূর্ত মেয়েটা। রূপলাল জানে কাকে কি ভাবে সমুত করতে হয়। তাই কামিনীর কথায় বলে, বেশি কথা আমি পছন্দ করি না। যা

বললাম তাই করবে। বুঝলে?

কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো বলে চলে যায় রূপলাল।

এবার ভাবনায় পড়ে কামিনী। এভাবে শয়তানের হাতে নিজেকে তুলে দিতে পারবে না। সে বেশ বুঝেছে ওই রূপলালই খুনী। কিন্তু প্রমাণ কিছুই রাখেনি সে। শুধু তাই নয়, একটা খুন করে পার পেয়ে গিয়ে রূপলালের সাহস বেড়েই যাবে, তারই পূর্বাভাস পাওয়া গেল আজ ওর কথায়।

কামিনীর ঘুম আসে না। হু-হু রাতের বাতাস বইছে ঘুমন্ত জনবসত। তারার আলোয় মাঠ-নদীর ধারে ভেড়িটা দেখা যায়। ওদিকে দূর গাঁয়ের মাছমারা কোনো নৌকার লণ্ঠন যেন ঢেউয়ে মাথায় দুলছে।

কামিনী আজ নিজের পথই বেছে নিয়েছে। এখানে ওই শয়তানের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে না। তার চেয়ে চলেই যাবে এখান থেকে। নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করবে এই আবাদ থেকে অনেক দূরের কোনো জনপদে। তাই রাতের অন্ধকারে ঘর ছেড়ে আজ পথে নেমেছে সে।

কিন্তু জানত না রূপলাল আগে থেকেই সাবধান হয়েছে। ঘরের বাইরে পা দিয়েই দেখে তাদের চালার ওদিকে বাইরে একটা চটকা গাছের নিচে বিড়ির আগুন জ্বলছে।

থমকে দাঁড়ায় কামিনী। আড়াল থেকে দেখে, হ্যাঁ, সনাতন। ওই রূপলালের বিশ্বস্ত অনুচর। বসে আছে তাদের ঘরের দিকে নজর রেখে। কামিনী বুঝেছে শয়তানের ব্যাপারটা। আর কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই। পালাতেই হবে তাকে। সামনের পথ দিয়ে নয়, কামিনী পিছনে গাঙের আড়ালে নেমে যায়।

তখন ভাটার টান শুরু হয়েছে। গাঙের জল কিছুটা নেমেছে। ওই মরা ভাটির কাদায় পা টিপে টিপে কামিনী বসতের বাইরে গিয়ে এবার ক্রশ ভেড়ির পথ ধরে অন্ধকারে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে। পেছনে চায় মাঝে মাঝে। নাহ্। কেউ জানতে পারেনি। সনাতনও সামনের

দরজা আগলে বসে আছে। জানতেও পারল না যে মরা গাঙের হাঁটুভোর কাদা ঠেলে কামিনী পালিয়েছে।

পুঁইজালির হাটতলা বাঁধের নিচে খানিকটা জায়গায় কয়েকটা দোকান বসে, আর হাটবারের দিন আশপাশের গ্রামবসত থেকে দু-দশজন তাদের ক্ষেতের সামান্য ফল-ফসল, ঘরের চালের কুমড়ো, না হয় ক্ষেতের কলা নিয়ে আসে। আর হাটুরে নৌকায় সওদা নিয়ে আসে কিছু দোকানদার, সকাল থেকে দোকান পসার সাজায়, বিকিকিনি করে সাঁঝের বেলায় নৌকা নিয়ে চলে যায়।

এখান থেকে হাসনাবাদ অবধি লঞ্চ একটা চলে। রাতের বেলায় লঞ্চটা আসে যাত্রী নিয়ে, রাতভোর এখানের ঘাটে গেরাপি করে থাকে, আবার ভোর রাতে সূর্য ওঠার আগে পুঁইজালি ছেড়ে পাড়ি দেয় শহরের দিকে।

রতন তার লঞ্চ গেরাপি করে, পর্দাগুলো সব ফেলে, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ঘুমোচ্ছে লঞ্চের ছাদে সারেঙের ঘরটায়। নিচে লঞ্চের খোলে ঘুমোচ্ছে তালেব আর মধু। ওরা লঞ্চের ইঞ্জিন-ড্রাইভার আর শুখানি।

রাত কত ঠিক জানা যায় না, হঠাৎ কার ডাকে জেগে ওঠে রতন। বন্ধ কাচের জানলায় কে টোকা দিচ্ছে। জেগে উঠে রতন, তারার আলোয় কামিনীকে দেখে অবাক হয়।

—তুমি! এত রাতে।

কামিনী বলে, খুব বিপদে পড়ে এসেছি সারেঙ। এই ভোরেই আমাকে নে চলো শহরে। তোমার ডাকেই ছুটে এসেছি। ইখানে থাকতে মন চায় না গো।

রতন দেখছে কামিনীকে। তারার আলোয় ওর ডাগর চোখে কি যেন আকুতি ফুটে উঠেছে। রতন সেদিনই ওকে যেচে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল। আজ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছে কামিনী।

খুশিতে ফেটে পড়ে রতন।

সত্যি বলছো? তোমার বাড়ির মত হবে তো?

কামিনী বলে, বাড়ি ছেড়েই এসেছি সারেঙ তোমার জন্য। এখন তুমি যদি ফিরিয়ে দাও—

রতন বলে, না-না। এসো, ভিতরে বসো। এতটা পথ এই রাতে ঠেলে এসেছো? ধন্যি সাহস তোমার।

কামিনী বলে, এ ছাড়া আর পথ ছিল না সারেঙ।

ভোর হবার আগেই আজ রতন পুঁইজালি ছেড়ে যেতে চায়। ভোরে এখানের দোকানদার দু-একজন উঠেছে। সারেঙের কোণের ঘরে বসে আছে কামিনী। গাঙের বিস্তারে ফিকে কুয়াশার জাল পাতা।

টিং-টিং করে ঘণ্টা বাজে। দু-একবার হর্ন বাজিয়ে ঘুমন্ত হাটতলায় শব্দ তুলে লঞ্চটা যাত্রা শুরু করে। হুইলে বসেছে রতন। মাথার ওপর লঞ্চের মাস্টার-ল্যাম্পটা জ্বলছে। লঞ্চ এগিয়ে চলে।

রতন বলে, তাহলে কূল ছেড়ে অকূলেই ভাসলা শেষমেশ?

কামিনী অপসৃয়মাণ গাছগাছালি, দু-একটা ঘরকে দেখছে। ওখানে মানুষ যখন শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, তখন পথে হারিয়ে গেল কামিনী।

রূপলাল খবরটা যখন পায়, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। অবশ্য পুরো খবর পায় না। জানেও না কেউ। কামিনীকে কেন আর দেখা যাচ্ছে না। খলসেখালির গঞ্জে! কর্পূরের মতো উবে গেছে মেয়েটা।

রূপলাল গর্জে ওঠে সনাতনের ওপর, রাতভোর তুই কি করাছিলি হারামজাদা?

সনাতন বলে, ঠায় জেগে বসেছিলাম। মা গঙ্গার কিরে মালিক! কাউকেই বার হতে দেখিনি।

রূপলাল বলে—তাহলে মেয়েটা গেল কোনদিকে?

সনাতন তখুনিই তার জবাব দিতে পারে না। বলে—আমি খোঁজ করছি।

সনাতন জানে কান টানলেই মাথা আসে।

মেয়েটার আগে কিছু ঘটনা ছিল গোবর্ধনের সঙ্গে।

কিন্তু গোবর্ধন বারিক এখন আর এ জগতে নাই। সেই আড়ত এখন রূপলালবাবুর দখলে, তাহলে গেল কোথায় কামিনী ?

শেষ অবধি মদনকেই ধরে সনাতন।

মদন কামিনীর ভাই। সে এখন রূপলালের জালেই কাজ করে। তার অন্ন সংস্থান করতে হয় এখান থেকেই। কামিনী যে কেন এভাবে হঠাৎ পালালো তা সেও বুঝতে পারে না।

তাই সনাতনের প্রশ্নের জবাবও দিতে পারে না সে।

—কি রে, বোনটা তোর গেল কোথায় ?

—কি জানি বাবু।

—চোপ শালা মিছে কতা বলছিস ? গর্জে ওঠে সনাতন। সেই-ই বলে,

—তুই সব জানিস তোর বোনের খবর। বল শালা কোথায় গেছে, নাহলে তোকে আর জাল নৌকা কিছুই দেব না। মরবি শালা না খেয়ে।

মদন সেটা জানে, এখানে তার অন্ন গেলে না খেয়ে মরতে হবে। বোনটা এখানে থাকলে রূপলালবাবুর দয়াও সে পেতো।

তার দিন ভালোই চলতো।

তা নয় বোনটা পালালো। পালালো না মারা গেছে তাই বা কে জানে।

তাই বলে, বোনটা পালালো না মরে গেল গাঙে ডুবে তাই বা কে জানে সনাতনদা।

সনাতন কি ভেবে বলে,

—তোর বোন মরবে না রে এত সহজে, ও অনেককে মেরে তবে মরবে। কে জানে আর কোন নাগরের সঙ্গে ভেগেছে কিনা ?

মদন কথাটা শুনে চমকে ওঠে।

একজনের কথা মনে পড়ে, সে রতন সারেঙ। ছেলেটা এর মধ্যে দু'-একবার এসেছে এখানে। ও এলে কামিনী খুশিতে ঝলমল করে উঠতো।

হাট থেকে খাবার, সন্দেশ আসতো। কামিনী নিজে তাকে রান্না

করে খাওয়াতো।

দুজনে নদীর ধারে নির্জনে বসে কত গল্প করতো।

সনাতন বলে,—আর কে আসতো তোদের বাড়িতে ওই কামিনীর কাছে ?

এই মদনা—বল, বল ঠিক করে !

মদনা কি ভাবছে। সনাতন ধমকে ওঠে,

—কি হল রে ? কতা বল !

মদন এবার জানায়,

—রতন সারেঙ। পুঁইজালি লাইনের লঞ্চের সারেঙ, ছেলেটা আসতো মাঝে মাঝে কামিনীর কাছে।

সনাতন এবার যেন আসল খবর পেয়েছে। বলে সে,—ওই ছোকরা ! পুঁইজালির সার্ভিস লঞ্চের সারেঙ ! তাহলে মেয়েটা নির্ঘাৎ ওই ব্যাটার সঙ্গেই ভেগেছে।

খবরটা শুনে রূপলাল কি ভাবছে।

বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিল সে ঘরের মধ্যে। সনাতন বলে, —মনে হয় ওই সারেঙটার সঙ্গেই পালিয়েছে কামিনী।

রূপলাল চমকে ওঠে—ঠিক বলছিস ?

সনাতন বলে, তাই মনে হয়।

—তাহলে ব্যাটাকে আজ রাতেই লঞ্চ থেকে তুলে আন। দেখি সেটাকে, আমার 'হক্' ছিনিয়ে নিলে তার কি শাস্তি দিই সেইটাই দেখাবো ওকে।

কামিনীও এ ব্যাপারে খুব সাবধানী। ও জানত রতন ওই লাইনে লঞ্চ চালালে একদিন না একদিন তার খবরও ঠিক বেরিয়ে পড়বে। তাই কামিনীই রতনকে প্যাসেঞ্জার লঞ্চের সারেঙগিরি ছাড়িয়ে দীঘার ওদিকে মাছ ধরার ট্রলারে কাজ খুঁজে নিতে বলে।

রতনও তাই চায়। লাইনের লঞ্চে তেমন পয়সা নেই। ট্রলারে তার তুলনায় মজুরি অনেক বেশি। ঝুঁকি অবশ্য একটু আছে, কারণ মাছ

ধরার নৌকা পিছনে বেঁধে নিয়ে তাদের দূর সমুদ্রে যেতে হয়। বিপদ সেখানে পদে পদে। তবু পয়সা ভালো মেলে, আর ট্রলারের সারেঙ নিজেও মাছ সস্তায় কিনে ডাঙায় এনে বিক্রি করে মোটা টাকা লাভ করতে পারে।

তাই রতনও সুযোগ খুঁজতে দীঘায় গিয়ে হাজির হয়। ফলে ওদের খবর শুধু রূপলাল কেন, গঞ্জের কেউই আর পায় না। রূপলাল হেরে গেছে একটা মেয়ের কাছে। এত টাকা এত প্রতিপত্তি থাকতেও একটা মেয়ে তাকে ঠকিয়ে পালিয়ে গেল!

বিজলিও জীবনে অনেক ঠকেছে।

বিজলি কলকাতার উপকণ্ঠের শহরতলীতে মানুষ। ছেলেবেলাতেই ওর বাবা বানে-ভাসা খড়কুটোর মতো নানা ঘাটে ভাসতে ভাসতে শেষে স্ত্রী আর তিন মেয়েকে নিয়ে সোদপুরের ওদিকে একটা জলা জায়গায় একটু মাটি পেয়ে দরমার বেড়া দিয়ে কোনো ভাবে কয়েকখানা পুরনো টিন জুটিয়ে এনে তারই ছাউনি দিয়ে ঘর বানায়। ক্রমশ আরও কিছু ছন্নছাড়া মানুষ এসে জোটে ওখানে। সেই জলা হোগলা বন বুজিয়ে এখন ওখানে উঠতে থাকে জবরদখল ঝুপড়ি।

বিজলী ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে কঠিন-নগ্ন-নিষ্ঠুর সেই জীবন। বাবা স্টেশনের ওদিকে পথের ধারে সামান্য সব্জী, আনাজপত্র নিয়ে বসে। মা এর মধ্যে দু-একটা বাড়িতে কাজকর্ম করে।

বিজলি ছোট বোনদের নিয়ে বাজারের ওদিকে ঘোরে যদি কিছু খাবার মেলে। না হয় পাড়ার দু-একটা ছেলের সঙ্গে হেসে কথা বলে। এর মধ্যেই দেখেছে বিজলি তার ফ্রকটা ছোট হয়ে গেছে, বুকের সদ্যজাগর রেখাগুলো অনেক ছেলেকেই প্রলুব্ধ করে। চা-চপও খাওয়ায় তাকে দু-একজন।

কেউ নিভৃতে বেড়াতে যাবার কথাও বলে। কেউ-বা সিনেমা দেখাবার নাম করে অন্ধকার সিনেমা হাউসে নিয়ে গিয়ে ওর বুকে পিঠে হাত দেয়। বিজলি এই বয়সেই বুঝে গেছে কতখানি এগোতে দেবে ওদের।

দেখতে শুনতেও খারাপ নয় সে। ফর্সা খুব নয়—তথু মুখশ্রী আছে, আর গানের গলাও সুন্দর। ফলে পাড়ার থিয়েটার ক্লাবের শৌখিন ডিরেক্টার নরুদার নজরে পড়ে। নরুই বলে ওর মাকে,

—মেয়েটাকে থিয়েটার করতে দাও, চেহারাটা আছে। গানও গাইতে পারে। অ্যাকটিং শিখলে সিনেমা কোম্পানীতে ভালো চান্স পেতে পারে। চাইকি হিরোইনও হতে পারবে।

বিজলির মা জানে তাদের টাকার খুবই দরকার। পেটের জ্বালা মিটলে তবে অন্য কথা। আর মেয়ে যদি হিরোইন হতে পারে তাদেরও দিন বদলাবে। তাই বলে, কি কইছ নরু? বিজলি হিরোনি হইব?

নরু বলে, কে জানে মাসীমা, ওর বরাত। তয় চেষ্টা করতি দোষ কি? কন?

চেষ্টা অবশ্যই করেছিল নরু। বিজলিও। ক'মাসের মধ্যে বিজলিকে নরু রীতিমতো রিহার্সেল দিইয়ে পাড়ার স্টেজে নামিয়েছিল। মন্দ করেনি বিজলি। বাজারের আড়তদার গোবিন্দ সাহা ওর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নগদ একশো এক টাকা দিয়েছিল। সেটাই বিজলির জীবনের প্রথম রোজগার।

এরপর গোবিন্দ সাহা দু-একদিন বিজলিকে সন্ধ্যার পর ওর গদিঘরে যেতেও বলেছিল। তার চেনা কোনো যাত্রাদলের মালিক সেখানে আসে। একবার যাত্রার দলে নাম করতে পারলেও রোজগার কম নয়। গোবিন্দ সাহা বলে,

এহন তো টাকার লোভে তগোর ফিলিম কোম্পানীর হিরো-হিরোইনরাই যাত্রায় যাইত্যাছে। বিজু, একবার যদি তুমি যাত্রায় নাম করতি পার, ব্যস! আর গ্যাখতে হইব না—গাড়ি, বাড়ি সব পাইবা অনে।

গোবিন্দ সাহা ব্যবসাদার লোক। বিজলির গায়ে হাত বুলিয়ে তার পুরস্কার বাবদ খরচ হয়ে যাওয়া টাকার কিছুটা উসুল করে। আর তার চেনা যাত্রার দলওয়ালাও বিজুকে দেখে খুশি হয়।

বলে, গোবিন্দবাবু, আপনার ক্যানডিডেট যখন, তখন অরে তো

দলে নিমুই। ভয় এহন হিরোইন হইব না, সাইডেই থাকব। পরে দেখুম।

হরেকেষ্টবাবুর দলের খুব নামডাক তেমন নেই। লোকটা পরপর তুবার যাত্রার দল করে বেশ লোকসানই দিয়েছে। এবার বিজলিকে নিয়েছে গোবিন্দবাবুর কথায়।

গোবিন্দবাবু বিজলির জন্য কিছু করতে চায়। বলে,

হরেকেষ্ট ওরে দলে নাও, তোমারে হাজার দশেক টাকা দাদন দিমু। সুদ লাগবো না। তবে আসল ফেরৎ দিতে লাগবো।

হরেকেষ্ট যাত্রার দল নিয়ে দূর গ্রাম অঞ্চলেই গান গেয়ে বেড়ায়। তার দল এমন কিছু নামী নয়, কোন নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্রীও নাই যে সহর বাজারে তাদের আসর হবে। তাই গ্রামে গ্রামেই বাসে-নৌকায় অনেক জায়গায় রিক্সাভ্যানে করেও মাঠের রাস্তায় মালপত্র নিয়ে কিছু হেঁটেও যেতে হয়। তবু দলের মধ্যে বিজলির নাম ডাকই বেশি।

এখন তার রূপও খুলেছে। তবু পেট পুরে খেতে পায়, টাকাও দেয় তাকে হরেকেষ্ট।

কারণ হরেকেষ্ট যাত্রার দল চালায়। তাকে জানাতে হয় তার দলের প্রধান আকর্ষণ কে। সে ওই বিজলিই—আরও অনেক মেয়ে আছে।

তবে বিজলির মত বর্ষার ঢলনামা যৌবন—ওই চোখের চাহনি—কণ্ঠস্বর আর কারো নাই। মেয়েটা সাজতেও জানে আর অভিনয়—গান তুটোই ভালো করে।

তাই তাকে এখন অযাচিতভাবেই তু-দশ টাকা দেয়। গোপনে ভালো শাড়িও কিনে দেয়। কারণ তাকে হাতে রাখতে হবে দল চালাতে গেলে।

এই লাইনে অনেক দালালও আছে। কোন ভালো শিল্পীকে ছোট দলে দেখলে তাকে ভাংচি দিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন বড় দলের মালিকের হাতে তুলে দিলে মেয়েটাও তাকে কিছু দেবে, মালিকও।

ওই হরেকেষ্ট বিজলিকে নজরে রাখে।

ওদের বায়না আসে দূর দূরান্তের গ্রাম গঞ্জ থেকে। যেখানে বড় দল যায় না—সেখানেই এদের ডাক পড়ে। তাই হরেকেষ্ট এবার বসিরহাট—হাসনাবাদে যাত্রা করতে গেলে ওখান থেকে আবাদ অঞ্চলের গঞ্জেও তাদের বেশ কিছু বায়না আসে।

সনাতন এসেছিল বসিরহাটে।

সরকারী অফিসে কিছু কাজ ছিল আর তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই রতন সারেঙের খোঁজ করা।

ওই রতনের খোঁজ করতে সেদিন পুঁইজালিতে লঞ্চে গিয়ে দেখে রতন নাই—অন্য এক মাঝবয়সী লোকই লঞ্চ চালাচ্ছে তখন।

সনাতন ভেবেছিল রতনকে পাবে আর তুলে নিয়ে যাবে তাদের স্পিডবোটে, হাজির করবে মান্নাবাবুর কাছে। কিন্তু তা হয় না।

ওই সারেঙ বলে—রতন তো এই কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

—কি করছে ? কোথায় আছে সে ? সনাতন শুধোয়।

ওই লোকটি বলে—তাতো জানিনা। তবে শুনছিলাম বসিরহাটেই রয়েছে। ও নাকি মাছের ট্রলারে কাজ নেবে।

সনাতন তাই এসেছিল বসিরহাটে। দরকার হলে কৌশলে ওই ট্রলারে চাকরীর লোভ দেখিয়েই নিয়ে যাবে ওদের গঞ্জে। তাই লঞ্চঘাট—এখান ওখানে খোঁজ করে রতনের। ব্যাটাকে ধরতে পারলে কামিনীর খোঁজও পাবে।

কিন্তু কোন খবরই পায়না তাদের।

দুজনেই বসিরহাট থেকে চলে গেছে।

সনাতন হতাশই হয়।

সেদিন হাসনাবাদ ধানকলে যাত্রা দেখতে গিয়ে চমকে ওঠে। আসরে একটি মেয়ে অভিনয় করছে যেন কামিনীই। তবে ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ওর নাম বিজলি। তবে দেখতে কামিনীর চেয়েও সরেশ। তেমনি নাক-মুখ-মায় গলার স্বর অবধি।

আর চোখদুটোও তেমনি ডাগর। তবে এ যেন আরও ঝলমলে। দেখতেও সুন্দর।

সনাতনের মাথায় বুদ্ধিটা এসে যায়।

কামিনীকে না পাক তার চেয়েও সেরা একজনকে পেয়ে গেছে। মালিক একে দেখলেও খুশি হবে।

তাই যাত্রার শেষে হরেকেষ্টকে বলে সনাতন।

—অধিকারী মশাই খুব ভালো গান হয়েছে।

আমাদের গঞ্জে তিন পালা গাইতে হবে।

হরেকেষ্ট একসঙ্গে এক আসরে তিনপালা বায়নার আশা করে নি। খুশিই হয়। সনাতন বলে,

—সামনের সপ্তাহে ওখানে উৎসব। আজই বায়না করে দিই। লঞ্চে করে পুঁইজালি যাবেন—সেখান থেকে আমাদের খলসেখালি গঞ্জের রূপলালবাবুর নিজের লঞ্চ থাকবে পনেরো মিনিটে ওখানে পৌঁছে যাবেন। পাকাঘর, পায়খানা, খাবেনও ভালো, কোন অসুবিধা হবেনা।

হরেকেষ্ট এবার প্যাঁচ মারে।

—এত দূরের পথ, অনেক বায়না ক্যানছেল করতে হবে—

সনাতন চায় ওদের নিয়ে যেতে। তাই বলে,

—ওর জন্য ভাববেন না, সে আমরা পুষিয়ে দেব, তিন পালা গানের জন্য—

হরেকেষ্ট ধরতাই দেয়।

—আজ্ঞে নিদেন পনের হাজার টাকা দিতে হবে।

সনাতন বলে, বেশি হয়ে যাচ্ছে অধিকারী মশায়।

হরেকেষ্ট শোনায়,

—ওই বিজলি, ওর রেট কত জানেন ছ্যার? কেশবকুমার হিরো—কমিকে তারাপদ—না ছ্যার, এর কমে হবে না। কে যাবে ওই বাদাবনে! বাঘের মুলুকে—

শেষ অবধি সাড়ে বারো হাজারে রফা হয়, আর বায়নাবাবদ

আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বলে সনাতন,

—চলুন, গান ভালো হলে পুষিয়ে দেব। মাম্নামশাই খুব সৌখীন লোক। গুণীর কদর দিতে জানেন।

হরেকেষ্ট পালা গেয়ে হাজার-দেড় হাজার পায়।

সেও এই দাঁও মেরে খুশি হয়, সেই সঙ্গে ওদিকের আরও দু'-একটা গঞ্জেও বায়না পেয়ে যায়।

এখানের গান সেরেই ওরা যাবে ওখানে, সনাতন কামিনীকে পায় না। তবে তার চেয়ে সেরা জিনিসই নিয়ে যাবে।

কামিনী চেনে রূপলালকে।

ও জানতো রূপলাল মান্নার হাতটা অনেক লম্বাই। সে রতনের সন্ধানও করবে তাকে ধরার জন্য। ওই লোভী হিংস্র মানুষটাকে কামিনী ভয় করে। ও আবাদে অনেকের সর্বনাশ করেছে, নিষ্ঠুর ভাবে ডুবিয়ে মেরেছে গোবর্ধন বারিককে। তাকে ও শেষ করবে। তাই পালিয়ে এসেছে তার শেষ সম্বল যা ছিল নিয়ে। গোবর্ধন বারিক তাকেও কিছু গহনা, টাকা দিয়েছিল।

রতনকে বলে কামিনী—বসিরহাট এলাকায় থাকা ঠিক হবেনা।

রতনও ভাবছে কথাটা। তার জানাশোনা বেশ কিছু সারেঙ এখন দীঘার দিকে গেছে। সেখানে এই মরশুমে বেশ কিছু ট্রলার থাকে। হয়তো কোন ব্যবস্থা হবে।

বলে সে, তাহলে দীঘাই চলো।

কামিনী বলে, তাই চলো। ওদের লোকজন এখানে প্রায় আসে। এখানে থাকলে ওদের নজরে পড়ে যাবো।

ওরা পরদিনই দীঘার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে।

নতুন পরিবেশ। রতন, কামিনী দীঘায় এসেছে।

সমুদ্রের এদিকে অসংখ্য ট্রলার—নৌকার ভিড়। বালিয়াড়িতেই ক'মাসের জন্য অস্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। দোকান হোটেল সবই

আছে ওখানে, থাকার জন্য চালাঘরও পাওয়া যায় সামান্য ভাড়াতে। অনেকেই সপরিবারে এই বস্তিতে রয়েছে।

এদিকে ট্রলার—নৌকা থেকে ঝুড়িঝুড়ি মাছ নামছে, পাইকেরদের চীৎকার শোনা যায়, নীলামে দর ওঠে এখানে মাছের।

ওই ভিড়ের মধ্যেই রতন নস্কু সারেঙকে দেখতে পায়।

নস্কু সারেঙ তার গুরু, ওর লঞ্চেই—শুখানির কাজ করেছে রতন। ওর হাতেই লঞ্চ চালানো শেখে, নস্কুর এখন বয়স হয়েছে।

—তুই, রতন! আয়,

রতন যেন পায়ের তলে মাটি পায়।

ওর ডাকে চায়ের দোকানের মাচায় বসে। সব কথাই বলে তাকে রতন। জানায়,

—এদিকেই কাজের ধান্ধায় এসেছি, বৌটাকেও এনেছি। ওর জন্যই আসতে হলো।

নস্কু বলে, —চল, দেখি তোর বউকে, বউমা হয়।

—চাকরী! তার কি হবে?

রতনের কথায় নস্কু বলে—মালিকের চারটে ট্রলার। একজন বাড়তি সারেঙের খুব দরকার।

চল, আজই ঘাঁটিতে, মালিকের সঙ্গে কথা বলে দিই। তবে, দিনকতক আমার ট্রলারে থেকে দরিয়ার ব্যাপারটা বুঝে সমঝে নিতে হবে। এ-নদী গাঙ নয় যে, এ হল সুমুদ্দুর! এর মর্জি মেজাজই আলাদা। আছে বেশ, শান্ত, ব্যস—মাতলো তো পাহাড় সমান ঢেউ —ঢেউয়ের মাথায় পড়লে ট্রলার ছট্‌কে দেবে। তখন ওই দুই ঢেউয়ের তলেই—

রতন শুনছে কথাটা।

তবু তাকে চাকরী করতে হবে। বলে সে,

—তাহলে মালিকের গদিতেই চলো। কাজটা যদি হয়।

নস্কু অভয় দেয়—ও তোর হয়েই গেছে ধর। আমার লোক তুই।

নস্কু বাজে কথা বলেনি, এক কথাতেই ওর চাকরী হয়ে যায়। আর

মাসখানেক নম্বুর সঙ্গেই ওর ট্রলারে থেকে দরিয়ায় ট্রলার চালানোটা রপ্ত করে নিতে হবে।

এবার রতন নম্বুকে নিয়ে আসে তার ওই চালাঘরের আস্তানায় পরিচয় করিয়ে দেয় রতন।

—কামিনী, এই আমার গুরু।

কামিনী প্রণাম করে। নম্বু দেখছে ওকে

—বেশ লক্ষ্মী পিতিমের মত চেহারা রে ! থাকো—সুখে থাকো।

কামিনী বলে—বসুন, চা আনি।

কামিনী চা আর মুড়ি নিয়ে আসে সঙ্গে গরম চপ। এখানের বসতে ওই সবই মেলে, অন্য কিছুর জন্য তাদের বালিয়াড়ি ভেঙ্গে দীঘার বাজারে যেতে হয়।

কামিনী ক্রমশঃ এখানের জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

তার মত আরও অনেক মেয়ে আছে। স্বামী দরিয়ায় গেলে তারা দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে কখন ফিরবে তার ট্রলার। দূর থেকে ট্রলারটা দেখলে ওরা খুশি ভরে তীর ধরে ছুটে যায়। হাত নাড়ে।

কামিনী এখানে এসে ভুলেছে সেই জীবনের কথা। রতন তাকে ঠকায়নি। প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তাকে। এক ক্ষেপ সমুদ্র থেকে ফিরলে তিন চারদিন ছুটি তার নগদ পয়সাও কিছু আসছে।

কামিনী তার থেকেই জমাচ্ছে কিছু কিছু করে।

রতন বলে—বেশ কিছু টাকা পেলে সরকার বাকী টাকা ঋণ দেয় ট্রলার কিনতে। নিজের ট্রলার হলে আয়ও হবে ভালো।

কামিনীও স্বপ্ন দেখে, তাদের দিন বদলাবে।

হরেকেষ্ট অধিকারী বায়নাপত্র করেছে। এদিকের গান শেষ করে এবার দল বল নিয়ে, সাজের বাক্স তীর ধনুকের বোঝা, টিনের তলোয়ারের গোছ আর ওই যাত্রার শিল্পীদের নিয়ে ন্যাজাট লঞ্চঘাট থেকে নৌকায় বসেছে। লঞ্চেতে যায়নি ওরা। নৌকা চলতে শুরু করে। গাঙের বিস্তারও বাড়ছে। হরেকেষ্ট হিসাবী লোক। দিন

ভোর যেতে হবে। তাই হাসনাবাদ থেকেই সে একরাশ পাউরুটি কলা, পান এক হাঁড়ি কাঁচাগোল্লা সঙ্গে জলও নিয়েছে, দুপুরের খাওয়া বলতে ওই-ই। আর কিছু মেলেনা এখানে।

বিজলির মনে হয় যেন হারিয়ে গেছে সে। শুধোয়—আর কত দূর গো। এ-যে দুনিয়ার শেষ মাথায় এসে গেলাম। এখনও যেতে হবে কোন চুলোয়? মানুষজন থাকে সেখানে—যে গান শুনবে?

দূরের পথ। লঞ্চে করে, না হয় নিজের নৌকা ভাড়া নিয়ে দলবল, মালপত্র সমেত ভেসে যেতে হবে এই গঞ্জ থেকে অন্য গঞ্জে। শেষ হবে ওদের গান খলসেখালির গঞ্জে। সেখানে ধুমধাম করে গঙ্গাপুজো হয়, আর এই প্রথম সেখানে তিন পালা গাওনা হবে হরেকেষ্টর যাত্রার দলের।

গাঙের বুকে ভেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এদের ছিল না। ক্লান্তিকর পথ, দুরন্ত ঢেউয়ের মাথায় নৌকা মোচার খোলার মতো দুলছে। যাত্রার দলের অনেকেই বলে, কোথায় যাচ্ছি গো? এ্যাঁ—ফিরবো তো? না এই শেষ যাত্রা? হরেকেষ্ট বলে,

—পয়সা পাচ্ছিস না? এ্যাঁ—নগদ দিচ্ছি, বলে কোথায় যাচ্ছি? তোদের গান শহরের বাবুরা শোনবে? তোরা ধ্যাড়াবি। তোরা বাদা-বনেই যাত্রা গা। বলেনা আদাড় গাঁয়ে শেয়াল রাজা। ও মাঝি—গোবিন্দকাটির হাটতলা আর কতদূর বাপ?

মাঝি হাল মারতে মারতে জানায়, লুই ট্যাকের মাতায়। চুপ মাইরা বসেন বাবু। রায়মঙ্গল গাঙে পাড়ি দিতাছি, বাবার নাম লন।

বিজলিও এদের সঙ্গে ভেসে চলেছে কদিন। তার মনে হয় সে নিজেও যেন জীবননদীতে এমনি টালমাটাল খেয়েই ভেসে চলেছে। ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথের সন্ধান তো সে পায়নি।

ভাসতে ভাসতে তারা এসে পৌঁছেছে আবাদের শেষ বসত খলসে-খালির গঞ্জে। একদিকে বিশাল নদী, সামনে তেমোহনা, জল আর জল। ধু-ধু তার বিস্তার—একদিকে ছোট খাল, ওপারে ছায়াসবুজ

বনভূমি। জিরি জিরি কেওড়া-পাতায় হলুদ-সবুজ আভা। আরও কত কি গাছ গজিয়েছে ওই জলাভূমিতে। এ অঞ্চলের শেষ বসত। আদিম অরণ্যের শুরু এখান থেকেই।

এপারে করাতকল, বিরাট কাঠগোলা, ওদিকে মাছের আড়ত। ঘাটে বেশ কিছু ছোট-বড় নৌকা। একটা লঞ্চও বাঁধা আছে। ওদিকে সবুজ গাছগাছালি ঘেরা বিরাট বাড়ি, মাছের আড়তের ওদিকে করাতকল, কাঠের গোলার কর্মচারীদের থাকার জন্য কাঠের লম্বা ব্যারাকমতো।

তার পাশেই বন-অফিস। জায়গাটা এরই মধ্যে জমজমাট। বনে যাবার সময় মাছ-মারার দল, কাঠবাওয়ালিরা এখানের দোকানে সওদা করে, আনাজপত্রও নেয় আর তুলে নেয় মিঠে জল, কদিনের জন্য।

তাই কিছু দোকান বসে। চটকা গাছতলায় ইরফান মৌলী মা বনবিবি, বাবা দক্ষিনরায়ের মূর্তি বসিয়ে ধূপধুনো দেয়। গাঙদেশের মানুষেরা সকলেই বনবিবি-দক্ষিণরায়কে বাতাসা চড়িয়ে যায়।

ওপাশের মাঠে যাত্রার আসর সাজানো হয়েছে।

রূপলাল মাছের কারবারেও এখন বেশ দু-পয়সা রোজগার করছে। লোকটার বরাত আছে। কাঠগোলা, করাতকল চলছে রম-রম করে। তারপর মাছের ব্যবসা শুরু করলো এই সেদিন নেহাৎ জেদের বশেই। যার জন্য মাছ ব্যবসা শুরু করেছিল সেই কামিনী হারিয়ে গেলেও ব্যবসাটা কিন্তু ছাড়েনি রূপলাল। সেবার গঙ্গাপুজোয় ছিল কামিনী, এবার নেই। তবু পুজো হবে বেশ ধুমধাম করেই।

যাত্রাগান হবে তিন রাত। কলকাতা থেকে যাত্রার দল আনছে রূপলাল। খবরটা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তেই লোকজন, দর্শকের দলও আসতে শুরু করে। ডিঙি নৌকা, বেতনাই নৌকা, গহনার নৌকায় করে কাতারে কাতারে মেয়ে-মরদ আসছে। চাল, চিঁড়ে বেঁধে এনেছে। গ্রীষ্মের দিন। দিনে গাছতলায় রান্না করে খেয়ে নেবে।

সন্ধ্যায় মুড়ি-চিঁড়ে খেয়ে রাতভোর কবি, মুর্শিদা, যাত্রাগান শুনে

কাটাবে। বসিরহাট থেকে মোটা টাকা দিয়ে রূপলাল দু-তিনটে জেনারেটার আনিয়েছে। সন্ধ্যার আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে ভটভট শব্দ করে সেগুলো চালু হয়ে যায়। সারা এলাকা, গাঙের ধার, মেলাতলা আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এ সেই বাদাবনের জগৎ যেন নয়, শহরেরই আশপাশ। আলো, দোকানপসার, কলরব সবই আছে।

কলকাতার যাত্রার দল এসে পৌঁছাবার খবর চলে গেছে খোদ রূপলালের কাছে। রূপলাল ক'দিন সব বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। সে নিজেই লোকজন, আলো নিয়ে এসেছে আপ্যায়ন জানাতে। কলকাতার দল বলে কথা! পান থেকে চুন খসলে মুসকিল হবে। একটোরদের মুড ঠিক রাখতে হবে।

নৌকা থেকে জেটিতে নামছে যাত্রাপার্টির শিল্পী, বাদ্যকার, কলা-কুশলীর দল। দু-চার জন মেয়েও নেমেছে।

বিজলি এতক্ষণ নৌকার মধ্যেই ছিল। নৌকা থেকেই দেখেছে নদীর ঘাটে, জেটিতে বহু কৌতূহলী লোকজন এসে হাজির হয়েছে। হ্যাজাক জ্বেলে খোদ মালিকই তদারক করছে। তরল কণ্ঠে বিজলি বলে, কোথায় নামবো গো—অ' ম্যাস্টর, সবদিকেই যে জল আর কাদা।

এক ঝলক টর্চের আলোয় দেখছে রূপলাল বিজলিকে। ওর রূপ-যৌবন যেন জোয়ারের গাঙের মতো ফুঁসছে।

বিজলিও দেখেছে রূপলালকে। বলিষ্ঠ, পেটা চেহারা। বাদাবনের বন্যতা কি এরই নাম!

কে বলে, এদিকে নামেন আজ্ঞে।

বিজলি এগিয়ে আসে।

রূপলাল ওকে নৌকা থেকে নামার পথ দেখাবার জন্যই তার হাতের পাঁচসেলের বড় টর্চটা জ্বেলেছিল। কিন্তু ওই আলোয় বিজলিকে প্রথম দেখেই চমকে ওঠে। এ যেন কামিনীই।

সেই চোখ-মুখ তেমনি যৌবন-মাতাল দেহ! আরও আশ্চর্য সেই হাসিটাও রয়েছে ওর মুখে। বিজলি বলে—আলোর ছটায় চোখ

ধাঁধিয়ে গেল যে গো। বাতিটা নেভাও।

চমক ভাঙে রূপলালের। আলোটা নেভায় সে। এর মধ্যে দু-তিনটে হেজাক নিয়ে লোকজন এসে গেছে।

সনাতন দেখছে তার মালিককে। ওর চোখের চাহনিতে সেই আদিম লালসার ছায়া, ওটাকে চেনে সনাতন।

কামিনীর বদলে আর এক কামিনীকেই এনেছে সে মালিকের সামনে। খুশি হয় রূপলাল।

হরেকেষ্ট চালু পুরিয়া। এত লোকজনের ভিড়ে সে রূপলালকে যেন চিনেছে, রাশভারী চেহারা। পরনে ভালো ধুতি পাঞ্জাবী, সনাতনই বলে,

—বাবু, ইনিই দলের অধিকারী হরেকেষ্টবাবু। উনি গঞ্জের মালিক—রূপলালবাবু!

হরেকেষ্ট বিনীত নমস্কার করে বলে—আজ্ঞে ওই আমাদের হিরোইন, বিজলী দেবী, ফিল্ম—কলকাতার এস্টেজের একনম্বর হিরোনী। এখানে এত দূরে কি এসতে চায়—কত করে বলে কয়ে এখানে এনেছি। দেখবেন ওর একটো, যেমন একটো, তেমন গান আর নাচ। এস্টেজ কাঁপিয়ে দেবে ছ্যার।

বিজলি দেখছে রূপলালকে।

বলে বিজলি—অ' অধিকারী মশায়, দিনভোর তোমার নৌকায়, গুড়ের নাগরীর মত ঠায় বসে হাতপা টাটিয়ে গেছে, চান খাওয়াও নাই। বলি, বাসা-টাসার ঠিক ঠিকানা আছে না এই গাঙের কাদাতেই পড়ে থাকতে হবে?

নৌকা থেকে নেমেছে ওরা। এবার কুলিরা সাজের বাক্স ওই সব মাল নামাচ্ছে, হরেকেষ্ট বলে—যন্ত্রপাতি এস্টেটপত্র সাবধানে নামাবি বাবা। তা সনাতনবাবু, এদের বাসা-টাসা দেখিয়ে দেন, দিনভোর ধকল গেছে।

রূপলাল বলে,

—সনাতন, ওদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক আছে

তো? দেখো, এতদূর থেকে এসেছেন এরা এদের কোন অসুবিধে যেন না হয়। তাহলে একা তোমার-আমারই নয়, সারা খলসেখালি গঞ্জের বদনাম হবে।

গাঙের ধারে তখনও ভিড় রয়েছে। দর্শকদের ভিড়, অনেকেই যাত্রার দলের মানুষদের দেখতে এসেছে। এখন এরা সাধারণ মানুষ পরে এরাই রঙ মেখে পোষাক পরে এক একজন মহাবীর—কোন রাজকন্যা—কেউ সেনাপতি, কেউ রাম—সীতাও হয়ে যাবে।

রূপলাল বলে, দেরী করোনা সনাতন, মাল নেমেছে এদের বাসায় নিয়ে যাও।

সনাতন এখন যাত্রার দলের লোকদের দেখভালের দায়িত্বে আছে। সে বলে, বাবু, ওদের করাতকলের কোয়ার্টারে নিয়ে যাই তাহলে? ওখানেই কল, জল আছে।

হরেকেষ্ট যেন কৃতার্থ হয়। বলে সে, ওতেই হবে। চলো হে সবাই।

রূপলাল এর মধ্যেই তার মনস্থির করে নিয়েছে। বলে সে, —ম্যানেজারবাবু!

হরেকেষ্ট বলে, আজ্ঞে আমিই দলমালিক।

রূপলাল শোনায়—তা বেশ, আপনি দলবল নিয়ে করাতকলেই যান। সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ছেলের মধ্যে মেয়েদের যে অসুবিধে হবে! মেয়েদের আলাদা কল নাই ওখানে। ওরা বরং আমার ওদিকের গেস্ট হাউসে থাকবে।

বিজলি দেখছে রূপলালকে। তিন-চার দিন থাকতে হবে এখানে। একটু ভালোভাবে নিরিবিলিতে থাকতে চায় সে, কিছুটা আরামে। তাই বলে বিজলি, তা অসুবিধা হবে না তো সেখানে?

সনাতন জানায়,

না, না। পাকাবাড়ি—পাকা পায়খানা—কল, স্নানের ঘাট—নরম গদি—

বিজলি বলে, এত সুখ কি সইবে? অ' অধিকারীমশায়?

দলের অন্য মেয়ে মলিনা বলে, তাই চল বিজু, ওঁরা যখন বলছেন!

রূপলাল বলে, হ্যাঁ, চলো। কোন অসুবিধা হবে না।

গেস্ট-হাউসটা ভালোই রেখেছে রূপলাল। ফরেস্ট-এর অফিসার, সেচবিভাগের কর্তারা, কাস্টমস্-এর লোকজন মাঝে মাঝে আসেন। রূপলাল এই আশ্রয়টা তাঁদের জন্যই গড়েছে, আর এটার জন্যই রূপলাল এই অঞ্চলের ভেড়ি বাঁধার ভালো কাজ পায়।

কাস্টমস্-এর লোকেরাও জানে মাঝে মাঝে ওপার থেকে বিদেশী নানা জিনিসই আসে এদিকে রাতের অন্ধকারে রূপলালজীর লঞ্চেও সেসব মাল এদিক-ওদিক হয়ে থাকে। ওরা দেখেও দেখে না।

স্নান সেরে কাপড়-চোপড় বদলে এসে বারান্দায় বসে মেয়েরা। সামনে নদীব বিস্তার, ওপারে রহস্যময় অরণ্যসীমা। আজ এখানের রূপ তাদের চেনা। মাইক বাজছে—আলোর অভাব নেই। লোকজনের ভিড় দেখা যায় মেলায়, নাগরদোলা ঘুরছে। বাতাসে পাঁপড় ভাজার গন্ধ।

চা এসেছে, সঙ্গে বিস্কুট, চারটে বড় সন্দেশ, কলা।

বিজলি বলে,

নারে মলিনা, এখানে এসে ভালোই করেছি। তিন-চার দিন একটু আরাম করা যাবে, যা ধকল গেছে ক'দিন নৌকায় ঘুরে, বাব্বাঃ।

রাতে খাবার ব্যবস্থাও হয় গেস্ট-হাউসে আলাদা করে।

ভাত, ডাল, সব্জী, মাছ-ভাজা, মাছের ঝাল। এর মধ্যে রূপলাল নিজেই এসেছে একবার। বিজলিও চিনেছে মানুষটিকে। এই এখানে সব।

রূপলাল শুধোয়, তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? কলকাতার শিল্পী তোমরা—আমরা বাদাবনের মানুষ। ক্ষমাঘেন্না করে মানিয়ে নেবে।

বিজলি বলে, না না এ তো দারুণ ব্যবস্থা। এত দূরে এসে এসব পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। দারুণ সাজিয়েছেন জায়গাটাকে আপনি!

রূপলাল দেখছে বিজলিকে। নিজেদের সাজাতে জানে এরা। সাজানোর কদরও দিতে জানে। স্নান সেরে নিয়েছে। মুখে প্রসাধনের ছোঁওয়া। চুলগুলো পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে, কাজলপরা কালো চোখে

স্বপ্নের আবেশ, হাতগুলো মোমের মতো মসৃণ, হাসলে চোখের তারায় ঝিলিক ওঠে, নরম গালে টোল পড়ে। রূপলাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে বিজলিকে।

মনে পড়ে কামিনীর কথা। কামিনীরও যৌবন ছিল। কিন্তু সে কেমন যেন এলোমেলো ও অগোছালো নিজেকে সাজাতে জানত না। তার তুলনায় বিজলি যেন সত্যি বিজলির আলো। রূপলাল বলে, সনাতন, ধারে-কাছে থাকবি। এদের কখন কি দরকার পড়ে দেখবি। চলি, ওদিকে একবার করাতকলেও যেতে হবে। ওদের ব্যবস্থা কি আছে দেখিগে।

চলে যায় রূপলাল।

মলিনা বলে,

বিজু, তোর জন্যই এই আরামে থাকতে পেরেছি রে। না হলে ফাঁকা ইস্কুলঘরের ঐ করাতকলের কাঠের ঘরের মেজেতে গড়াগড়ি দিতে হতো। আর ঢালাও খিচুড়ি, লাবড়া প্রসাদ। লোকটা তোকে খুব খাতির করছে কিন্তু। বিজলি বলে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। শেষে গড়বড় না হয়।

মলিনা বলে, গড়বড় কি লা? বল বরাত খুলে যাবে যদি ওর নজরে পড়িস। বিরাট টাকা। এসবের মালিক। শুনেছি বিয়ে-থাও করেনি। তিন কুলে কেউ নেই। যদি জুত করে হাতে আনতে পারিস সারা জীবন আর ভাবতে হবে না।

বিজলি বলে, কি বলছিস মলিনা? অ্যাকটিং ছেড়ে দেব?

হেসে ওঠে মলিনা.

ঝাঁটা মার এমন অ্যাক্টির হওয়ার মুখে। পায়ের তলে মাটি নাই, যাযাবরের মতো ঘুরেই মরা আর তোকেও বলি হা হা দা দা করে কি পাস? পাস তো মাত্তর ক'টা টাকা। তাও হরেকেষ্টর দয়ায়। সারা বছরে চার মাস যাত্রাগান। তারপর ওই অফিস-ক্লাবে চান্সের খোঁজে ঘোরা, সিনেমার ছবিতে শুধু মুখ দেখানো। একেই বলিস শিল্পীর জীবন? ভালো খাওয়া-পরাও জোটে না। জোটে শুধু কতকগুলো

হাঘরে বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে হয়রানি। নিজের আখের গুছিয়ে নিতে শেখ বিজু। সুযোগ একবারই আসে, তাকে ধরে যে নিতে পারে সেই-ই জেতে।

বিজলি বলে ওঠে, ছাড় তো, এত হিসাব বুঝি না। ঘুম আসছে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

সকালেই ঘুম ভাঙে বিজলির পাখির কলরবে। সামনে পুবদিকে ছোট গাঙে জোয়ারের উচ্ছ্বাস। কূল ছাপিয়ে বনের বুক ঠেলে উঠে গেছে জোয়ারের জল। সূর্যের আলোয় সিন্দুরবরণ হয়ে উঠেছে জলরাশি। গাঙচিলের দল জোয়ার-ভরা নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে মাছের সন্ধানে। দূরে ওই তেমোহনার বিস্তারে একটা নৌকা পাল তুলে উধাও হয়।

বিজলি নেমে আসে বাগানে। মাইকের শব্দ এখন নেই। জেগে আছে পাখিদের কলরব। বাগানটা বেশ সাজানো। আম, কাঁঠাল, কলা, কি নেই! লোকটাকে বেশ শৌখিন বলে মনে হয়।

বাগানের ওদিকে একটা সুন্দর বাড়ি। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বিজলি ওই বাড়ির দিকে। মাঝে একটা গ্রিলের গেট। গেটটা খোলা দেখে বিজলি ওদিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল বিজলি।

—আপনি?

রূপলাল সকালে নিজেই বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছে।

বিজলি বলে, নিজের হাতে বাগান করেন, তাই এত সুন্দর হয়ে আছে।

রূপলাল বলে,

সকালে একটু দেখি মাত্র। তারপর দিনভোর তো অন্য ধান্দা। এসো। এত দূর এসে এককাপ চা খেয়ে যাবে না তা কি হয়! বিজলিকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকলো রূপলাল। বেশ ছিমছাম সাজানো ঘরগুলো। দোতলা থেকে বন, নদী সব যেন হাতের কাছে

পাওয়া যায়। রূপলালের লোকজন এর মধ্যেই মাননীয় অতিথির জন্য চা এনেছে।

রূপলাল বলে, ঘর কিন্তু শূন্যই রয়ে গেছে। একা পুরুষমানুষের সংসার—অগোছালো থাকবেই।

বিজলি দেখছে রূপলালকে। শুধোয়, বিয়ে-থা—

হেসে ওঠে রূপলাল,

সময়ই পাইনি ওসব ভাবার।

কি যেন ভাবছে রূপলাল। বলে,

—এবার ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু কি জানো? বয়স তো হয়ে এল—

—কি এমন বয়স আপনার?

রূপলাল বলে, আটচল্লিশটা বছর কিন্তু কম নয়।

হাসে বিজলি, বয়স দেহে নয়, মনে। সেদিক থেকে আপনি তরুণই।

হেসে ওঠে রূপলাল। বলে সে,

দারুণ বলছো, এই না হলে কলকাতার শিল্পী। একটা কথায় বাজীমাৎ।

সকালেই এসেছে হরেকেষ্ট গেস্ট-হাউসে খবর নিতে। আজ সকাল থেকেই রিহার্সেল দিতে হবে। তিনটে পালা গাইবে তিন দিনে। বড়জোর দুটো পালা এদের তৈরি থাকে সিজনের জন্য।

বাকি আর একটা গতবারের হিট। সেটাকে ভালো করে রিহার্সেল দিতে হবে। তাই ওদের খবর দিতে এসেছে হরেকেষ্ট। মলিনা-বীণারা উঠেছে, চাও এসে গেছে।

হরেকেষ্ট বলে বিজলিকে দেখছিনা? ঘরে তো নাই!

মলিনা বলে, ছিল তো। এসে পড়বে। চা তো খান।

হরেকেষ্ট বলে, সকাল আটটা থেকে মহড়া, ওই করাতকলে। বিজুকেও দরকার।

হঠাৎ হরেকেষ্ট থেমে যায়। দেখছে হরেকেষ্ট বিজলি দূরে ওই

রূপলালের বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, সঙ্গে রূপলাল। হাসছে দুজনে।

মলিনাও দেখেছে ব্যাপারটা। হরেকেষ্টকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে শুধোয় মলিনা, কি হলো গো অধিকারীমশায় ?

হরেকেষ্ট বলে, না, কিছু না। বিজলিটা যেন এমটু লয়ে বেড়ে উঠেছে। এসব ভালো নয়। ওকে বলো। ভেরি ব্যাড।

মলিনা জবাব দেয়, বলতে হলে তুমিই বলো বাপু। তোমার হিরোইন।

হরেকেষ্ট বলে,

বলবই তো। দলের সুনাম বলে কথা। চলি—ওকে রিহার্সেলে আসতে বলো। আগে যাত্রার যশ, তবে অন্য কথা। যতই খাতির করুক, ঠিক মত গান না হলে বিপদ। ভালো গাইতে না পারলে ট্যাকা না দিয়ে তাড়াবে, তা জানো ? কড়া নায়কপক্ষ, বাদাবনের বাঘ। বুঝলে ?

যাত্রাগান প্রথম দিনেই জমে যায়। 'লায়লা মজনু'র প্রেমকাহিনী। লায়লা করেছে বিজলি, মজনুর সঙ্গে মানিয়েছেও সুন্দর।

আর নাচ-গানে বিজলি ভালোই, রঙিন আলোর খেলার মধ্যে ওর উচ্ছল নাচ, গান দর্শকদের মাতাল করে তোলে। সিটি বাজছে। হাওয়ায় বাদাবনে টাকা-আধুলি ওড়ে আসরে।

বাদাবনের এই শেষ সীমায় এর আগে কলকাতার কোন যাত্রার দল আসেনি, এখানের আশপাশের সৌখীন দলের দু'-একটা পালা হয়েছে মাত্র। তাও বনবিবির মহিমা ; দক্ষিণরায়ের দয়া, সোনাভাণের গান এইসব পালা। মেয়ে সাজে ছেলেরাই।

তার তুলনায় এদের পালার চমক বেশি। আসল মেয়েরাই অভিনয় করছে, তেমনি সাজগোজ—গান বাজনাও সুন্দর, মানিয়েছে ভালো।

ওরা মুগ্ধ হয়ে শোনে।

গাঙ ভরে ওঠে ডিঙিতে, নৌকায়। দূর আবাদ বসতি থেকেও মানুষজন এসেছে কাতারে কাতারে।

আসরে চেয়ার পেতে বসেছে রূপলাল, ওদিকে বেঞ্চে বসেছে এখানের গণ্যমান্য কয়েকজন, পুলিশ অফিসার ফণীবাবু—ওদিকে বন বিভাগের সেই বসন্ত গোলদারও এখন রূপলালবাবুর অন্ধভক্ত, কৈলাশ ডাক্তারও বসেছে।

চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ।

স্তব্ধ হয়ে তারা দেখছে বিজলির নাচ—তার এ্যাকটিং! বেহালা বাজছে করুণ সুরে।

এই ফাঁকে ফাঁকে রূপলাল মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও রাখছে ওদিকের ঘরে, বিলাতী মদ—মাছ ভাজা এসবও আছে।

যাত্রার কনসার্ট—নাচ এসব এখানে বেশি করে দিতে হয়, হরেকেষ্ট জানে বাদাবনে নাচগান চাই লোকের। তাই অঙ্কের ফাঁকে নাচ-বাজনা চলে।

আর বসন্ত গোলদার ফণীবাবু—আরও দুচারজন নিমন্ত্রিত অতিথি এসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলে মেজাজ রঙিন করে আসরে বসে সবাই।

বসন্ত বলে—নাঃ খাসা দল এনেছেন মান্নাবাবু, একেবারে ফাস্ট ক্লাশ!

আপনার ওই নায়িকার জবাব নাই।

রূপলালও খুশি হয়, মেয়েটা যেন বিজলিই, তেমনি ঝলক দেয়, কোথায় লাগে কামিনী, আজ বিজলি'ক দেখে রূপলাল কামিনীর বিয়োগ ব্যথা ভুলেছে, আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে রূপলাল।

আসরে তখন দর্শকদের হাততালির শব্দ ওঠে।

বিজয়গড়ের রাজকুমারী নিজেই নিজের তার প্রিয় সেনাপতিকে নির্বাসন দণ্ড দিচ্ছে, তার প্রেমিককেও জনগণের স্বার্থে বিসর্জন দিচ্ছে, চোখে জল—আদেশে কাঠিন্য।

—আহা হা—বসন্তবাবু হাহাকার করে।

রূপলাল অবাক দৃষ্টিতে দেখছে বিজলিকে।

সনাতনও খুশি হয়েছে, তার নির্বাচন সার্থক হয়েছে।

রূপলাল সনাতনকে ইশারায় ডেকে কানে কানে কি বলতে সনাতনও ঘাড় নেড়ে চলে গেল, একটু পরেই মাইকে ঘোষণা শোনা যায়।

—রাজকুমারী ললিতার ভূমিকায় নায়িকা বিজলিদেবীর অপূর্ব অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে রূপলাল মান্না মশায় তাকে স্বর্ণপদক দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আসরে হাততালি পড়ে।

সাজঘরে তখন হরেকেষ্ট খুব খুশি, খুশি হলে সে ঘন ঘন ফুক ফুক করে বিড়ি টানে। বলে হরেকেষ্ট,

—জমিয়ে দিইছিস বিজু, আসর জমে একেবারে কুলপি হয়ে গেছে। চালিয়ে যা।

সামনের বছর থেকে তোর ডবল মাইনে বাড়িয়ে দেব। নায়ককে বলে,

—কেতো, বেশ গলা তুলে এগিয়ে গে চেঁচিয়ে বল।

কিলাপ নিতে হবে বাপধন, আসর গরম করে দে!

আবার সাজের বাক্সের উপর বসে ফুক ফুক করে বিড়ি টানে আর পা দোলাতে থাকে।

আসরে রূপলালও জাঁকিয়ে বসেছে এবার পারিষদবর্গকে নিয়ে।

হাসে সনাতন। বেশ বুঝেছে তার পছন্দ খারাপ নয়। সেই গেইয়া কামিনীর কথা এখন একেবারে ভুলে গেছে রূপলাল। তার জায়গা নিয়েছে ওই বিজলি।

দু-তিন দিন দেখতে দেখতে কেটে যায়। বিজলি মনে মনে খুব খুশি। রূপলালের অনেক কাছে এসে গেছে সে।

রূপলাল বলে, লঞ্চে করে বেড়াতে নিয়ে যাবো।

—সময় কই রূপলালবাবু। কালই তো যেতে হবে। আবার নৌকায় দশ দিনের পাড়ি। কটা বায়না গেয়ে হাটে-মাঠে ঘুরে সেই কলকাতায় ফেরা। জানায় বিজলি।

রূপলাল শুধোয়,

এই আবাদ, খলসেখালি তোমার কেমন লাগছে? এখানকার মানুষদেরই বা কেমন লাগছে?

বিজলি বলে, এখানের মানুষ বলতে দেখলাম তো কাছ থেকে একজনকেই।

—কেমন লাগলো?

বিজলি কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে,

—ভালোই। জায়গাটাও সুন্দর। তাছাড়া বাদাবন, বলে বোঝার তো উপায় নেই। আমার তো মনে হয় থেকেই যাই এখানে!

রূপলাল দেখছে বিজলিকে। বলে সে,—ঠাট্টা করছ?

বিজলি বলে, ওমা! ঠাট্টা কেন করবো? যা সত্যি, তাই-ই বললাম।

রূপলাল কোনো জবাব দিল না।

অদ্য শেষ রজনী। হরেকেষ্ট পালাগান নিয়েই ব্যস্ত। দু-রাত্রি ভালোই গেয়েছে। শেষ রাত্রিতেও ভালো গাইতে হবে। তাহলে বায়না আবার পাবে এদিকে। তাই সে আসরে বসে তদারক করছে। বিজলি আজও দারুণ অভিনয় করেছে। খুশি হয়েছে হরেকেষ্ট। মেয়েটাকে এবার আরও ভালো করে কাজে লাগাবে।

কদিন যেন একটা ঝড়ের মধ্যে কেটেছে রূপলালের, বিজলির সঙ্গে সেদিন লঞ্চ নিয়ে বেড়াতে গেছে নদীতে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

গাঙ থেকে ওদিকে নদীর ধারে সেই বিদেশী কোম্পানীর করাতকল তাদের কলোনী দেখে বিজলি শুধোয়,

—এখানের সবই তো দেখি আপনার, ওই কলটাও? দেখছে রূপলাল, ওদিকে স্পিডবোটে করে যাচ্ছে অনিমেষ। তাকে দেখে হাত-নাড়ে সে।

বিজলি দেখছে ওই তরুণটিকে।

নিজেই সাদা রাজহাঁসের মত একটা স্পিড বোট চালাচ্ছে সে, চোখে সান গগলস্। বিজলি শুধোয়,

—উনি কে?

রূপলাল বলে, ওই করাতকলের ম্যানেজার, ওটা কোন অন্য কোম্পানীর, তবে কতদিন চলবে কে জানে!

বিজলি দেখছে রূপলালকে।

বলে সে, এত খেটে এতসব গড়েছেন, নিজের কথা ভাবুন এইবার।

রূপলাল বলে—এবার ভাবছি।

—তাই নাকি? বিজলির দুচোখে কৌতুকের ঝিলিক।

বলে সে—তাহলে নেমন্তন্ন পাবো তো? না কাল চলে গেলে আবার ভুলেই যাবেন?

রূপলাল কথাটা ভাবছে। বলে সে,

—না, না, তোমাকে ভোলা যায় না বিজলি!

বিজলি হাসে খিলখিলিয়ে। বলে সে,

—ও আপনার মন রাখা কথা।

রূপলালকে চেনেনা বিজলি, তাই বলে কথাটা।

রূপলাল চুপ করে থাকে, আঁধার নামছে, গাঙের বুকে সোনা রোদের রঙ ক্রমশ বেগুনি তারপর ঘন বেগুনি থেকে অন্ধকারে পরিণত হয়। তারাগুলো জেগে ওঠে।

বিজলি বলে—এবার ফিরতে হবে। গান শুরু হবে দশটায়।

রূপলাল বলে—অনেক দেরী।

তারপর শুধোয়—কালই চলে যাবে তোমরা?

বিজলি বলে,—হ্যাঁ। কাল দুপুরেই যেতে হবে। কাল এখান থেকে গে কোতায় মোল্লাখালির হাটতলায় গান—

তারপর দিন কোন চুলোয় আর পনেরো বিশ দিন ঘাটে ঘাটে ঘুরে তবে ফিরবো সেই ক্যানিং বাজারে।

—এই ভাবে পথে পথে ঘুরতে ভালো লাগে?

রূপলালের প্রশ্নে বিজলি বলে, —না বললে কেউ শুনবে ? ছাড়বে ওই হরেকেষ্ট ! তাছাড়া পেট তো আছে, কাজ না করলে চলবে কি করে মামামশাই ? এমন বরাত তো করিনি যে কেউ বসিয়ে খাওয়াবে।

রূপলাল কি ভাবছে,

কদিন যেন নেশার ঘোরেই কেটেছে। বিজলি যেন তাকে নেশার মত পেয়েছে, ওই বিজলিকে তার নিজের সম্পদ বলেই মনে হয়

ও চলে গেলে এই আবাদের প্রাণই যেন চলে যাবে। রূপলাল সেই বিজলিশূন্য এই আবাদের কথা ভাবতেই পারে না। কাজ তো আছেই, দিনরাত নানা কাজ করে সে আজ দিন বদলেছে, এবার নিজের দিকে চেয়ে সব যেন শূন্য মনে হয়।

এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতেই হবে।

হরেকেষ্ট ছটফট করছে, কদিনই দেখছে ওই মান্নাবাবু যেন তার নায়িকার দিকে একটু বেশিই ঝুঁকেছে, মেয়েদের এতটুকু বিশ্বাস করেনা হরেকেষ্ট, বিশেষ করে এই লাইনের মেয়েদের।

আজ তোমার তো কাল কখন আর একজনের হয়ে যাবে তা কেউ জানেনা, এ যেন পদ্মপত্রে নীর ; এই আছে, এই নাই, তাই নজরে রাখে মেয়েদের।

এখানে ওই মান্নাবাবু এদের স্পেশাল খাতির করে গেস্ট হাউসে কেন রেখেছিল তা এবার বুঝছে, হরেকেষ্ট এসেছে এখানে।

মলিনাকে শুধোয়—বিজলিকে দেখছিনা ?

মলিনা বলে—সে তো এই মান্নাবাবুর সঙ্গে লঞ্চে করে হাওয়া খেতে গেল, মান্নাবাবু এসে নে গেলেন।

চমকে ওঠে হরেকেষ্ট।

—তুই বললিনা কেন ? রাতে গান আছে—

লতা বলে,—মিয়া বিবি রাজী তো ক্যায় করেগা কাজী, তোমার ‘টপী’ জানেনা যে গান আছে ?

যাত্রার দলে হিরোকে বলা হয় ‘টপ’ আর হিরোইন-এর স্ত্রীলিঙ্গ

করে নিয়েছে এরা 'টপী'।

হরেকেষ্ট বলে, —এসে অবধি দেখছি বিজলি কেমন বেতালা চলছে!

মলিনা এদলের সেকেণ্ড নায়িকা।

তার সাধ সে নায়িকা করবে, কিন্তু দেখেছে বিজলি আসরে এলে কেমন যেন আসর গরম হয়ে যায়। তার ছলাকলায় চোখের ভাষায় দর্শক মেতে ওঠে।

হরেকেষ্টও তাই বিজলিকে নায়িকাই রেখেছে।

আবার কাল সাজঘরে ওর দর বাড়াবার কথাও শুনেছে মলিনা। তাই সে বলে,

—কেন গো, ডবল রেট করে দিলে?

হরেকেষ্ট বলে—বেচাল দেখলে আউট করে দেব, দলের আইন কানুন মানবেনা, আরে বাবা—কে ডাকলো আর তুই হাওয়া খেতে চলে গেলি! কার হুকুমে?

মলিনা বলে—কতাটা ওকেই শুধিয়ো,

—তা শুধোবোই। আসুক সে!

হরেকেষ্ট বলে—তোরা তৈরি হয়ে থাক। আটটায় গ্রীণরুমে যাবি, দশটায় পালা শুরু করতে হবে।

হরেকেষ্ট বের হয়ে আসে।

ওদিকে গাঙে নৌকা ডিঙির ভিড় শুরু হয়েছে, দর্শকরা কাতারে কাতারে আসছে, অস্থায়ী চা-মুড়ি ঘুগনি-বেগুনীর দোকানগুলোয় ভিড় শুরু হয়।

দেখা যায় ঘাটের দিকে আসছে মান্নাবাবুর লঞ্চটা।

বিজলিকেও দেখা যায় মান্নাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে যেন রাজরানীর মত।

সেই রাতের গানও বেশ জমে ওঠে।

অন্ত শেষ রজনী। আসর ভরে উঠেছে। গান শেষ হয় ভোরের দিকে।

এবার যাবার পালা।

সকাল হয়। এরা তখনও ঘুমুচ্ছে। এদের রাতজাগার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়।

হরেকেষ্ট উঠেছে।

সেইই অন্যদের তোলে।

—ওরে ওঠ, বেলা হয়ে গেছে, মালপত্র গোছগাছ কর, সাজের বাক্স গুছিয়ে নে, অ গুরুপদ, এস্টেটের জিনিষপত্তর সব লিষ্টি করে গুছো।

ওহে বাদ্যকর, তোমার যন্ত্রপাতি দেখেশুনে নাও বাপধন, পরে অন্য আসরে গে বলবে এটা নাই—ওটা ফেলে এসেছি, এসব শুনবো না। মাইকওয়ালাকে বল জিনিষপত্র প্যাক করে নৌকায় তুলুক, ওহে কিষ্ট, ওই একটোরদিকে তুলে দে—তৈরি হয়ে নিক, আমি মান্না-মশায়ের কাছে হিসাবপত্র চুকিয়ে নে এসতেছি, এর মধ্যে রেডি হয়ে নৌকায় চল সবাই।

মান্নাবাবু তখন তার অফিসে।

হরেকেষ্টকে দেখে বলে—তাহলে আজ যাচ্ছেন ?

হরেকেষ্ট বলে—আজ্ঞে, আজ রাতে গাওনা আছে। নদীর পথ—একটু বেলাবেলি পৌঁছতে হবে, তাহলে বিদায় দেন—

রূপলাল কি ভাবছে।

—ওহে এদের হিসাবটা আনো।

সনাতন কাগজ আনে, রূপলাল বলে,

—বাকী টাকা দিয়ে দাও, আর দলের ওদের জন্য পাঁচশো টাকা বকশিস দাও।

সনাতন ওকে সব টাকা মিটিয়ে দিতে এবার হরেকেষ্ট খুশি হয়েছে। এত টাকা বিশেষ পায় না তার দল, এখানে তা পেয়েছে। বলে হরেকেষ্ট,

—তাহলে চলি,

রূপলাল বলে—যান, তবে একটা কথা—

চাইল হরেকেষ্ট, মান্নাবাবুর কণ্ঠস্বর কেমন গুরুগম্ভীর।

—বলুন! হরেকেষ্ট শুধোয়।

মান্নাবাবু বলে,

—দলকে যেতে দেব, তবে একটা সর্তে।

—মানে! ঘাবড়ে যায় হরেকেষ্ট, বুঝেছে এ সাংঘাতিক লোক।

—সবাই যাবে. তবে যাবে না একজন, সে এখানেই থাকবে।

হরেকেষ্ট অবাক হয়, একজন থাকবে? মানে?

রূপলাল আলমারি খুলে বেশ কিছু টাকা হরেকেষ্টর সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে,

—বেশি কথা আমি বলি না। দশ হাজার বাড়তি দিচ্ছি,—না হয় পনেরো হাজারই দিলাম বেশি। এখুনি দলবল নিয়ে চলে যাবে। শুধু বিজলি যাবে না। ও থাকবে এখানে।

হরেকেষ্ট আর্তনাদ করে ওঠে,

—তাহলে দল চলবে কি করে? দেখলেন তো ওই দলের সেরা। ওর নামেই বায়না ছ্যার।

—বেশ, পুরোপুরি বিশ হাজার দিলাম। যদি প্রাণে বেঁচে ফিরতে চাও যা বললাম তাই করো, না হলে আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। তবে কথা দিচ্ছি, তোমার বিজলি ভালোই থাকবে এখানে, কোনো অযত্ন হবে না।

হরেকেষ্ট কোনো জবাবই দিতে পারে না। তবে এটা বুঝেছে যে লোকটা সাংঘাতিক প্রকৃতির মানুষ। ও যা চায়, তা পাবার জন্য সবকিছুই করতে পারে।

দলের অন্যরাও অবাক হয়, বেরুতে হবে ওকে ছেড়ে?

হরেকেষ্ট বলে, আজ সন্ধ্যায় মোল্লাখালির হাটতলায় গান। দূরের পথ, তাই একটা জোয়ার হাতে রেখে যাওয়াই ভালো, না হয় নৌকাতেই ঘুমুবে সবাই। চল এখানে থাকা ঠিক হবে না।

যাত্রাজগতের এই নিয়ম। ওরা যাযাবরের মতোই ঘোরে। তাই আর বিশেষ কথা বলে না কেউ।

অনেকে নৌকাতে গিয়েই শুয়ে পড়ে। মালপত্রও তোলা হয়ে গেছে। এই জোয়ারে ওরা বের হবে।

মলিনা বলে, বিজুকে বলে আসি। ও তো ওখানে রয়েছে।

হরেকেষ্ট বলে, ওকে খবর দিয়েছি। এসে যাবে ঠিক সময়েই।

আসল কথাটা সেও চেপে যায় দলের কাছে।

হরেকেষ্ট এখন বিজলিকে ছেড়েই দলের হিসাব করছে। বলে মলিনাকে,

ওটাকে তাড়াবো এবার মলিনা। তোকেই নায়িকা করবো। খুব বাড় বেড়েছে বিজলি। চল তো।

দল চলে গেল সাততাড়াতাড়ি ওই রূপলালকে বিশ্বাস নাই। তাই ওরা পালায়।

বিজলি এখানে ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে ও জানে বেলা দশটার জোয়ারে বের হবে তারা। ঘুম ভাঙতে দেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

সনাতন বলে, চা আনবো?

—আনো।

পাশের ঘরে গিয়ে বিজলি দেখে ঘর ফাঁকা। মলিনারা নেই। মালপত্রও নাই।

—এরা কোথায়?

সনাতন এসব জানে না। সে বলে,

তারা তো এই গোণে নৌকা নে চলে গেছে সবাই।

—সেকি! অবাক হয় বিজলি।

এসে পড়ে রূপলালও। সেও যেন আকাশ থেকে পড়ে সব শুনে।

—সে কি! দলের লোক এমন কর্তব্যজ্ঞানহীন যে তোমাকে ফেলে রেখেই চলে গেল?

বিজলি বলে, আমাকে পৌঁছে দিন যেখানে ওরা গেছে।

রূপলাল শোনায়, দেখছি কি করা যায়। যখন এত করে বলছো—

রূপলাল বের হয়েছে, লঞ্চ নিয়ে। বিজলিকেও নিয়েছে সঙ্গে। দল চলে গেছে ঘণ্টা চারেক আগে। অসংখ্য নদীর দেশ। কোন্ নদী ধরে গেছে তাও জানে না।

ফলে ঘণ্টা তিনেক এদিকে ঘোরাঘুরি করে এবার হতাশ হয়ে পড়ে বিজলি। রূপলাল বলে, —কাদের ওপর ভরসা করে দলে এসেছিলে বিজলি? এইভাবে তোমাকে ফেলে চলে গেল! আর এখনও তাদের কথাই ভাবছো তুমি?

বিজলি এবার বিপদে পড়েছে। বলে সে, —কিন্তু দল ছাড়া যাবার জায়গা যে আর নেই। কলকাতার কাছের বাড়িটা মেজ বোন দখল নিয়েছে। ছোট বোন থাকে দূরে। কোথায় যাবো এবার?

রূপলাল এবার পরম বন্ধুর মতো বলে,—এই কথা? জলে তো পড়ে নেই বিজলি! কি হবে ওই পথে পথে যাত্রা গেয়ে। রাতে ঘুম নেই, পায়ের তলে মাটি নেই। যদি আমাকে বিশ্বাস করো তাহলে বলবো, ফিরে চলো খলসেখালির গঞ্জে। ওখানেই আমরা দুজনে নতুন করে ঘর বাঁধবো। তোমাকে নিয়ে আমি আবার নতুন করে বাঁচবো বিজলি। লঞ্চটা নদীর বিস্তারে ভাসছে। ঢেউগুলো ওর গায়ে আছড়ে পড়ে। কূলহীন দরিয়ায় ভেসে চলেছে বিজলি, সামনে কোনো তীরভূমির সন্ধান নেই।

কোথায় যাবে জানে না। নোনা জল চারিদিকে, একবিন্দু পানীয়ের সন্ধানও নেই। এমন সময় এ যেন ছায়াতীরের সবুজ স্নিগ্ধতার সন্ধান পেয়েছে। পেয়েছে আশ্রয়, পানীয়ের স্বাদ। রূপলাল তাকে আজ বিরাট একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে।

বিজলি যেন ওর উপরই ভরসা করে।

—কি ভাবছো? শুধোয় রূপলাল।

রূপলালের কথায় আজ বলে বিজলি,—তুমি যে আমার এত বড় উপকার করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

রূপলাল ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে নিজেকে

সঁপে দেয় বিজলি। মলিনার কথাগুলো মনে পড়ে,

নিজের আখের গুছিয়ে নে বিজু, সময়-সুযোগ একবারই আসে।

—বিজলি আজ ওই যাযাবর জীবন থেকে সরে আসতে চায়। যেন যাযাবর হংসী তার যাত্রা থামিয়ে কোনো বনমরালকে নিয়ে ঘর পাততে চায় সবুজ ধরিত্রীর গহনে।

রূপলাল মান্না এতদিন পর আরও পাঁচজনের মতো বিয়ে-থা করে ঘর বেঁধেছে। বিজলিও তার অতীতের শিল্পীজীবন, তার স্বপ্ন, মঞ্চের মায়া ভুলে একটি ঘরের ঠিকানা পেয়ে খুশি হয়েছে।

খুশির মাদকতায় মেতে ওঠে বিজলি। তারই অনুরোধে চাঁদনী রাতে লঞ্চ নিয়ে বের হয় রূপলাল বনের দিকে। জ্যোৎস্নাধোওয়া বন, প্রকৃতির শিরশির ছন্দ ভাসে বাতাসে আর ভাসে নদীর কলতান। লঞ্চটা ওই বনের মাঝে চলেছে।

রূপলাল বিজলিকে দেখছে। কেবিনে ওরা দুজন। বিলাসের সব ব্যবস্থা মজুত। বিছানা পাতা, বনের খলসে কেওড়াফুলের মদির সুবাস জাগে।

বিজলি আজ অনেক পেতে চায়। রূপলালকে জড়িয়ে ধরে সে যৌবনের তীব্র কামনা নিয়ে। কিন্তু তার স্বপ্ন আচমকা খান-খান হয়ে যায় এক নিষ্ঠুর আঘাতে। বিজলির আহ্বানে সাড়া দেবার সাধ্য রূপলালের নেই। সে অক্ষম, অসম্পূর্ণ।

ভেঙে পড়ে বিজলি।

যাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল, চেয়েছিল নারীজীবনের চরম পরিতৃপ্তি সে পুরুষ হলেও ক্ষমতাহীন। রূপলালের জীবনের এই নিদারুণ দৈন্যের কথা এতদিন কেউ জানত না। আজ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বিজলির কাছে।

বিজলির চোখে শ্রাবণের ধারা নামে কিন্তু সে বেশ বুঝেছে এই চোখের জলের কানাকড়ি দামও কেউ দেবে না এখানে। এ সত্যিই অরণ্যে রোদন।

রূপলাল বলে, এর জন্যে এত কান্নাকাটি কেন? টাকা বাড়ি, গয়না—সব পাবে। সুখে থাকবে সারাজীবন।

বিজলি দেখছে এই মানুষটাকে। বলে সে,—কেন ঠকালে আমায়? কেন এসব কথা আগে জানাওনি?

রূপলাল বলে,

ঠকাইনি। একা থাকতে ভালো লাগছিল না, তোমাকে এনে রেখেছি। আর এইখানেই থাকবে তুমি। আমার হুকুম।

বিজলিও এখানে একটা স্বপ্ন নিয়েই রূপলালের আশ্রয়ে এসেছিল। এই স্বপ্ন সব মেয়েরাই দেখে। একজনকে নিয়ে ঘর বাঁধার। তার সংসারে আসবে নতুন অতিথি। ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হবে বিজলির ব্যর্থ জীবন।

এক আলোঝলমল জীবন থেকে সে এসেছিল গঞ্জের এই নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জীবনে। এর আগে আসরে আসরে অভিনয় করেছে। কখনো রাজকন্যা—কখনো সাধারণ মেয়ে—কখনো পরী। আলো সুরে ভরা তাদের জগৎ। শত কণ্ঠে প্রশংসার ধ্বনি ওঠে।

সেই খ্যাতি কলরব মুখর অভিনেত্রীর জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। আরও নামী দল থেকে ডাক আসছিল শহরে থাকতো নাম যশ হতো। খবরের কাগজে তার নাম ছড়াতো।

কিন্তু সেই আলো ঝলমল জীবন থেকে এখানে এসে এই বন্দীত্বও মেনে নিয়ে সুখী, সম্পূর্ণ হতে চেয়েছিল বিজলি।

কিন্তু তার সব আশা স্বপ্ন কি নিদারুণ ব্যর্থতাতে পর্যবসিত হয়েছে। সে মা হতে পারবেনা। ওই নিষ্ঠুর চরম স্বার্থপর লোকটা তাকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করে এখানে বন্দী করে রেখেছে।

বিজলি বলে—আমি এখানে থাকবো না।

হাসে রূপলাল। লোকটা তার ওই অক্ষমতাকে অন্ধ শক্তির দাপটে ঢাকতে চায়। বলে সে,

—আবার চলে যাবে?

—হ্যাঁ। আবার ওই যাত্রার দলেই যাবো। ওই জগৎই আমার

সব। আমাকে যেতে হবে—

রূপলাল বলে—এখানে রূপলালের হাত ছাড়িয়ে কেউ যেতে পারে না বিজলি। এখানেই থাকতে হবে তোমাকে।

—কেন? কেন থাকবো? কি দিয়েছ তুমি?

—টাকা—গহনা—কি দিইনি?

—মেয়েদের জীবনে ওটাই সব নয়। আমাকে যেতেই হবে।

এবার গর্জে ওঠে রূপলাল।

—চুপ করো। এখানেই থাকতে হবে তোমাকে। আমার কাছে। এই আমার হুকুম। আমার হুকুম না মানলে এখানে তার চরম বিপদই হয় এ-খবরটাও নিশ্চয়ই জানো।

চমকে ওঠে বিজলি।

বিজলি চেনে ওই মানুষটাকে।

ভয়ে সেও চুপ করে যায়।

রূপলাল বলে—কথাটা মনে রেখো।

চলে যায় রূপলাল। তার মন মেজাজও ভালো নেই।

বিজলি এই বন্দী জীবনকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দিন যায়, এখানের প্রকৃতিতে আসে শীতের হিমেল হাওয়া। তখন গাঙ শান্ত। রোদের রঙ বদলে যায়।

আসে গ্রীষ্মের দাবদাহ।

তবে এখানের নদীর বিস্তার চারিদিকে। ঠাণ্ডা তাই একটু থাকে। বিজলির মনে হয় সে যেন এই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোন গ্রহের বাসিন্দা।

কালবৈশাখীর মত্ততা ওঠে গাঙে।

কত নৌকা ডুবে যায়। কেউ যায় বাঘের পেটে। তবু খলসেখালির জীবনের ছন্দ বদলায় না।

বর্ষার রূপ এখানে ভয়ঙ্কর। কালো মেঘে ঢেকে যায় চারিদিক। গাঙ তখন ফুলে ওঠে। আবার বৃষ্টির ধারায় বনভূমিও ঢাকা পড়ে যায়।

বর্ষার ক'টা মাস এখানের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। জলেডোবা বন থেকে বাঘও এদিকে চলে আসে। রাতের অন্ধকার ভরে ওঠে ওদের ক্রুদ্ধ গর্জনে।

বিজলির ভয় করে। এখান থেকে মুক্তি তবু যেন সে পাবে না। ওই নিষ্ঠুর দৈত্য তাকে বন্দী করে রেখেছে।

এক এক সময় মনে হয় নিজেকে শেষ করে দেবে। কিন্তু পারেনি তার মনের অতলে একটা কাঠিন্য জেগে ওঠে। ওই দৈত্যটাকেই সে আঘাত দেবে। যে ভাবে হোক মুক্তি সে খুঁজে নেবে এখান থেকে। একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

বিজলি এমনি এখন এখানের পথে ঘাটে বের হয়। হাটতলা ছাড়িয়ে ওদিকে বন অফিস—কিছু গাছগাছালি ঢাকা বসত—তার পরই নদী।

জায়গাটার একদিকে নদীর ওপারে সুন্দরবন—অন্য দিকে বড় নদী—এপাশেও বিরাট খাল। তাতেও জোয়ার ভাটা খেলে; আসলে এটা একটা দ্বীপই। চারদিকে এর নোনা গাঙ। কুমীর কামটে ভরা। সামনে পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু। আর রূপলাল সেই মৃত্যুর জগতের প্রহরী। তাকে বন্দী করে রেখেছে।

সেদিন বিজলি বন বাংলোর এদিকে এসেছে। জায়গাটা নিরিবিলি, নদীর ধারে দু'একটা বেঞ্চও আছে। বিজলি বসে আছে—দূরে দু'একটা নৌকা উজানে চলেছে। কলকাতা কোনদিকে সঠিক জানেনা সে।

হঠাৎ নীচের ঘাটে একটা স্পিডবোটকে সগর্জনে এসে থামতে দেখে চাইল বিজলি।

দেখে সেইদিনের দেখা সেই তরুণটি। চোখে সানগ্লাশ। পরণে প্যাণ্ট সার্ট—বেশ স্মার্ট—কাঠের সিড়ি বেয়ে উঠে বন অফিসের দিকে যাচ্ছে।

হঠাৎ সামনে বিজলিকে দেখে অনিমেষ দাঁড়ালো।

বিজলিও দেখছে ওকে।

অনিমেষ বলে—আমি অনিমেষ সেন, পুঁইজালি করাতকলের ম্যানেজার, আপনি ? বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

বিজলি বলে—তাই বলতে পারেন।

হাসে অনিমেষ—এই বাদাবনে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

কারখানা—বন অফিস—বাদাবন ; এই করতে হয়। দেখুন বিচিত্র দেশটাকে—চলি।

অনিমেষ তর তরিয়ে ওই বিট অফিসের দিকে এগিয়ে গেল।

বিজলি নিজের আসল পরিচয়টাও দিতে পারে না। তবে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওই ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকে।

শুনেছে বিজলি রূপলাল নাকি চায়না ওই করাতকল এখানে থাকুক। তাতে তারই ব্যবসার অসুবিধা হচ্ছে। ও নাকি চেষ্টা করছে ওই কারখানাটার দখল নিতে।

বিজলির মনে হয় অনিমেষবাবুকে ও কথাটা জানানো দরকার। কিন্তু প্রথম দিনেই সেসব কথা বলা যায় না। তবু মনে হয় ওকে রূপলালের সম্বন্ধে সাবধান করা দরকার। রূপলাল ওরও কোন ক্ষতি করতে পারে।

বিজলিও ভাবছে কথাটা।

অবশ্য বছর খানেক আগেই রূপলাল খবরটা পায়। তার লোকজন চারিদিকে ছড়ানো। সেও খবর রাখে।

বছর কয়েক আগেই ওই বিদেশী কোম্পানী নাকি ওখানে করাত-কল বসাবার চেষ্টা করছে। কাজও সুরু করেছে।

খবরটা আনে রূপলালের করাতকলের ম্যানেজার হরিশবাবুই। সেই-ই একদিন বসিরহাট থেকে খবর আনে, কোনো বড় চা কোম্পানী, খাস বিলাতী কোম্পানী, নাকি পুঁইজালির ওদিকে বিরাট জায়গা নিয়ে নিজেদের কবাতকল বসাচ্ছে। বেশি দামে সব কাঠ কিনে তারা এখানেই পেটি বানাবে। অর্থাৎ রূপলালের একচ্ছত্র আধিপত্যে তারা থাবা বসাতে চায়।

রূপলালও খবরটা পাবার পর বাদা অঞ্চলে নিজের প্রতিষ্ঠা

জোরদার করতে উঠে পড়ে লাগল। তার অন্ধকারের বাহিনীকে আরো জোরদার করে তুলল। উঠে পড়ে লাগল এই এলাকাকে আতঙ্কিত এলাকা প্রমাণ করার জন্য। রাতে তার বাহিনী মালনৌকায় হানা দেয়, কোনো হাটতলায় নেমে পড়ে লুটপাট করে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, যাত্রীবাহী লঞ্চেও হানা দেয় মাঝে মাঝে। সারা এলাকায় তারা যেন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে।

বিজলির কানেও আসে খবরগুলো। বলে সে, এসব কি হচ্ছে? যদি কোনোদিন আমাদের বাড়িতেই ডাকাত পড়ে?

রূপলাল জানে তার বাড়িতে ডাকাত পড়বে না। তবু বলে সে,

সে সাহস ওদের নেই। গুলি করে শেষ করে দেব না?

ওদিকে পুঁইজালির এপাশের এলাকায় এদের বসতের একটু আগে ওই ছোট নদীর ধারে এখন বিশাল এলাকায় সেই বিদেশী কোম্পানীর করাতকল বসেছে। নতুন ম্যানেজারও এসেছে।

সেদিন রূপলাল গেছে ফরেস্ট অফিসে। নতুন এলাকায় বনকাটাই হবে। সারা বন এলাকাটা বেশ কিছু ব্লকে ভাগ করা হয় বনবিভাগের নকশায়।

কুড়ি বছর অন্তর এক একটা ব্লকে কাঠ কাটাই হয়। নতুন ব্লকে তাই ভালো গাছই থাকে, বিশেষ করে নেতি ধোবানী ব্লকে বাইন কাঠ সরেস। ওতেই চায়ের পেটি হচ্ছে।

রূপলাল এতকাল অনায়াসেই ওই সব ব্লকের কাঠ পেত। এবারও এসেছে তার জন্য। কিন্তু ফরেস্ট অফিসার বসন্তবাবুর ঘরে আর একটি তরুণকে দেখে চাইল রূপলাল। তরুণটির স্বাস্থ্যও বেশ শক্তপোক্ত। মুখে বুদ্ধির ছাপ। বসন্তবাবুই পরিচয় করিয়ে দেয়,

ইনিই অনিমেষ সেন। নতুন করাতকল, কাঠের ডিপোর ম্যানেজার। আর ইনি এখানের পুরনো কাঠ-মহাজন রূপলাল মান্না।

অনিমেষ নমস্কার করে রূপলালকে। বলে,—আপনার নাম শুনেছি এখানে এসে। একদিন পরিচয় করতে যাবো ভাবছিলাম। কি সৌভাগ্য

আজ দেখা হয়ে গেল।

রূপলাল দেখছে ওকে। তাহলে সত্যিই বাদাবনে রূপলালের ভাতে হাত দেবার মতো লোকের আবির্ভাব হয়েছে। ধূর্ত রূপলাল ব্যাপার-টাকে মোটেই গুরুত্ব দিতে চায় না। সহজভাবেই বলে,

না-না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমিও কম খুশি হইনি। দেখছেন তো বনের ধারে একেবারে বনবাসে পড়ে আছি। তবু আপনাদের মতো লোকজন আসছেন এখানে, এ তো ভালো কথা। খলসেখালির গঞ্জেই আমার বাড়ি। ওদিকে এলে আসবেন কিন্তু।

অনিমেষ বলে, নিশ্চয়ই। তাহলে আজ উঠি বসন্তবাবু, নমস্কার।

অনিমেষ চলে যাবার পর এবার রূপলাল তার নিজের কথায় আসে, ওই নেতি ধোবানীর ব্লকের কাঠ সব আমার চাই।

বসন্তবাবু বলে. কিন্তু তা এখন কি করে দিই? আগে আপনিই সব কাঠ পেতেন, এখন ওই অনিমেষবাবুদের কোম্পানীও টাকা দিয়েছে, ওদের মাল দিতে হবে। গাছ ভালোই আছে আধাআধি করে নিন।

সব গাছ তাহলে পাবো না? রূপলালের কণ্ঠস্বরও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বসন্তবাবু সুযোগ বুঝে নতুন কোম্পানী থেকে নগদ বেশ কিছু আদায় করেছে। রূপলাল যা দেয়, ওরা দিয়েছে তার প্রায় ডবল। তাই বসন্তবাবু এবার আইন দেখায়, বললাম তো রূপলালবাবু, আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন আইন মেনে চলতে হবে আমাকে।

—ঠিক আছে। রূপলাল মান্না কারো সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করে না। বরং মিষ্টি কথাই বলে, আইন তো মানতেই হবে বসন্তবাবু। চলি।

এত সহজে পার পেয়ে যাবে বসন্তবাবু তা ভাবেনি। ভেবেছিল সে পুরো বনের কাঠ না পেলে রূপলাল গোলমাল করবে, শাসাবে। কিন্তু রূপলাল তেমন কিছু না করাতে খুশি হয় বসন্তবাবু।

রূপলাল ব্যাপারটা বুঝেছে। আর তাই সে তার ফর্মুলামতো দাওয়াই প্রয়োগ করে দু-তিন দিন পরই। বসন্তবাবু খুশি মনে ফরেস্টের নৌকা নিয়ে ক্যাম্পে চলেছে। ওই বনে কাটার যোগ্য গাছগুলোতে

'হ্যামার মার্কা' দিতে হবে। ক'দিন থাকতে হবে। নৌকাটাও সেই-ভাবেই তৈরি। থাকার জায়গা, অফিসঘর, রান্নার জায়গা সব আছে। রাতের বেলায় সেই নৌকাতেই ডাকাতরা হানা দেয়। খবর ছিল অনিমেষবাবুদের দেওয়া দশ হাজার টাকা রয়েছে বসন্তবাবুর কাছে। বাদাবনের ঘরে বাক্স-সুটকেসে টাকা রাখা নিরাপদ নয়। চোরে নেবে, তাই বসন্তবাবু নোটগুলো তার তোশকে-বালিশে পুরে রেখেছিল। কিন্তু বাদাবনের ডাকাতরা টাকার গন্ধ পায়, বাঘ যেমন শিকারের গন্ধ পায়, ঠিক তেমনিই। রাতের হানাদাররা বসন্তবাবুকে ঘা কতক দিয়ে বিছানা থেকে তুলে ওই তোশক-বালিশ ফর্দাফাঁই করে টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়ে।

সকালেই আহত বসন্তবাবু এসেছে বন-অফিসে। বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে। কিন্তু টাকার কথাটা বলতে পারে না। বলে, এইভাবে মেরে গেল ?

রূপলালও খবরটা পেয়ে এসেছে।

সে জানত এমন একটা কিছু ঘটবে। বসন্তবাবুকে শিক্ষা দেবার জন্যই এটা ঘটানো দরকার।

বসন্তবাবু কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। ওর পিঠে কোমরে কয়েকটা লাঠির ঘা পড়েছে। বসন্তবাবু বলে, দেখুন রূপলালবাবু, সরকারী কাজ করেও পার নাই।

রূপলাল বলে, তাই তো দেখছি। এবার বুঝে সমঝে চলুন বনবাবু। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ না করাই ভালো। যাক্, অল্পের উপর দিয়েই গেছে এ যাত্রা।

বসন্তবাবু চমকে ওঠে। এবার কিছুটা বুঝেছে সে। এখানে বাস করতে গেলে, চাকরি করতে গেলে এই মুকুটহীন সম্রাটকে চটানো চলবে না।

বসন্ত বলে, তাই দেখছি। এবার প্রাণে বাঁচান রূপলালবাবু, নেতি ধোপানী ব্লকের সব কাঠ আপনি পাবেন।

বসন্ত গোলদারকে সমুত করার ঘটনাটা আগেই ঘটিয়েছিল রূপলাল। তারপর থেকে অবশ্য বসন্ত গোলদারও বুঝেছে যে এখানে বাস করতে গেলে রূপলাল মাস্নাকে পূজো দিতেই হবে।

সেই-ই তার ভক্ষক হয়েছে আবার তার শরণ নিলে রক্ষকই হবে। তাই বসন্ত এখন রূপলালের কথামতই চলে। বেশ জেনেছে অনিমেষবাবু কিছু টাকা দিতে পারে, কিন্তু তার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। তাই সব আইন এখন বসন্তবাবু প্রয়োগ করে রূপলালের স্বার্থেই।

এই শিক্ষা সে এখানে এসে প্রথম দিকেই পেয়েছে। তাই ও অনিমেষের করাতকলকে তেমন গাছ দিতে পারে না ইচ্ছা থাকলেও।

অনিমেষবাবুরাও বিপদে পড়েছে।

বাইরে থেকে কাঠ এনে ওই কারখানা চালানো যাবে না। এখানের কাঠই চাই। তাই আজ এসেছে অনিমেষ বসন্তবাবুর কাছে কাঠের স্পেশাল পারমিটের জন্য।

বসন্ত গোলদার জানে রূপলাল মাস্নায় ইচ্ছা নয় এখানে ওদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক। তাই অনিমেষকে দেখে একটু অপ্রতিভই বোধ করে সে। তবু আপ্যায়ন করে।

—আসুন স্যার! বলুন খবর কি?

অনিমেষ বলে,

—খবর তো ভালো নয়। এভাবে চললে কোম্পানী কারখানা বন্ধ করে দেবে।

—কেন? কেন? বসন্তবাবুও যেন উদ্বিগ্ন হয় এই খবরে।

অনিমেষ বলে,

—আর কেন? দরকার মত কাঠ না পেলে প্রডাকশন হবে কি করে? বেশ কিছুদিন থেকেই প্রডাকশন মার খাচ্ছে। এতগুলো লোকের রুজি-রুটির প্রশ্নও জড়ানো। মাল না হলে কোম্পানী তাদের বসিয়ে তো মাইনে দেবে না। ছাঁটাই করবে—নাহয় পুরোপুরি কারখানাই বন্ধ করে দেবে। এত লোক বেকার হয়ে যাবে।

বসন্তও যেন ভাবনায় পড়ে। মাথা চুলকায় সে।

—তাহলে তো সত্যিই বিপদ।

অনিমেষ বলে,

—আপনিই এই চরম বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন। কিছু কাঠ দিতে হবে।

—আপনার কোটামত কাঠ তো দিয়েছি!

অনিমেষ বলে,

—সে তো সামান্যই, স্পেশাল কোটায় কিছু কাঠ দিতে হবে।

বসন্ত জানে এভাবে কাঠ কাউকে দেয়নি সে।

অবশ্য রূপলালবাবুর ওসবের দরকার হয় না। এক পারমিটে সে চেক না করিয়ে তিন-চার বার মাল আনে। এরা সেটা পারে না।

তাই এদের কাঠ কম আসে—রূপলাল তার কোটার চারগুণ মাল বাড়তি পায়। বসন্তকে তার জন্য কোন স্পেশাল কোটা দিতে হয় না।

তাই এবার বসন্ত বলে,

—স্পেশাল কোটার কাঠ কাউকেই দিই না। মান্নাবাবুও বলে-ছিলেন। কিন্তু সরকার এখন বনরক্ষা করতেই ব্যস্ত। তাই স্পেশাল পারমিট আমি দিতে পারবো না স্যার।

অনিমেষ বলে গলা নামিয়ে,

—যদি বলেন—আপনার ব্যাপারটা—

ও জানে প্রণামী যদি কিছু দিতে হয়, দেবে। কিন্তু বসন্তের মনে পড়ে নৌকায় ডাকাতদের প্রহারের কথা। ও সব যে রূপলালবাবুর কীর্তি তা জেনেছে সে। তাই আর তাকে চটাতে চায় না।

বলে বসন্ত,

—স্যার। উপরে আপনাদের জানাশোনা। ডি. এফ. ও সাহেবকে বলে যদি কিছু পান—দেখুন। আমার হাত-পা বাঁধা। আমার করার কিছুই নাই।

—তাহলে কোন উপায়ই নাই? বলে অনিমেষ,

বসন্ত এবার বলে,

—সরি, ভেরি সরি স্যার!

অর্থাৎ সে কিছুই করবে না। হতাশ হয়ে বের হয়ে আসছে অনিমেষ।

বিজলি বাইরে নদীর ধারের বেঞ্চে বসেছিল। ওদের জোর গলার কথাগুলো সেও শুনেছে। বসন্তবাবু এমনিতে বেশ জোর গলাতেই কথা বলে।

বিজলিও এর মধ্যে খবর কিছু জেনেছে।

সেদিন ও দেখেছিল রূপলালের কথায় একটা জেদের সুর। ওদের ওই কারখানা করাতকল সেই-ই দখল করে নিতে চায়।

ওই লোকটা নিজেকে ভাবে এই বাদাবনের সম্রাট বলে। এখানে আর কারও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সে সইবে না।

যার যা কিছু আছে লুঠ করে সেই সবকিছুর মালিক হতে চায়। তাই ওদেরও তাড়াতে চায় নানা ভাবে উত্যক্ত, বিপন্ন করে।

বিজলির মনে হয় এই অনিমেষবাবুদের কারখানায় কাঁচামাল ঠিক মত যাতে যোগান না দেয় তার জন্য বসন্তবাবুকে চাপ দিয়ে চলেছে।

অনিমেষ বের হয়ে আসছে।

সেও কিছুটা হতাশ। হঠাৎ বিজলির কথায় চাইল।

—পারমিট পেলেন না তো?

অনিমেষ চাইল, বলে সে,

—আপনি!

হাসে বিজলি। বলে,

—শত্রুপক্ষই বলতে পারেন।

—শত্রুপক্ষ! আপনি! অনিমেষ অবাক হয়।

বিজলি বলে—আমাকে এখানে সবাই মান্নাবাবুর স্ত্রী বলেই জানে। আমি বিজলি।

—নমস্কার! অনিমেষ নমস্কার করে ওর পরিচয় পেয়ে।

অনিমেষ বলে—কোম্পানী এখানে কারখানা করেছে। এখানের লোকজন খুব গরীব। তাদেরও অনেকের রুজি রোজগার হয় ওখানে। কিন্তু প্রডাকশন না হলে কারখানা বন্ধ করে দেবে কোম্পানী।

লোকসান দিয়ে তো চালাবে না।

বিজলি বলে,

—ওই রূপলালবাবুও তাই চান।

অনিমেষও এতদিনে বুঝেছে সেটা। সে ওই মাম্নাবাবুকে চেনে।

এর আগে এখানে প্রথম এসে অনিমেষ নিজেই ওর সঙ্গে পরিচয় করতে গেছল। অবশ্য তখন বিজলিকে দেখেনি। কানাঘুষোয় শুনেছিল লোকটার সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র কথা। বিয়ে থাও করেনি। আবাদে ওর নামে নানা কথা শোনা যায়। আর এমনিতে লোকটা খুবই জেদী।

অনিমেষ নিজের পরিচয় দিতে রূপলাল ওকে আগাপাশতলা জরিপ করে বলে,

—বাদাবনে থাকতে গেলে আপনাদের মত কলকাতার বাবুদের খুবই কষ্ট হবে। এখানে তো লড়াই পদে পদে। পারবেন লড়তে?

অনিমেষ বলে,

—দেখি চেষ্টা করে! তবে আপনার প্রতিবেশী। তাই এলাম দেখা করতে। আপনারও করাতকল আছে—

রূপলাল বলে,

—শুনেছি একেবারে আধুনিক ধরনের মেসিন বসিয়েছেন। আমার তো সেকেলে সব মেসিন—তবে কেন যে কোম্পানী এখানে ওই কারখানা বসালো জানি না। দেখুন, যদি চালাতে পারেন।

ওর কথার সুরে একটা যেন চ্যালেঞ্জের ভাবই ফুটে ওঠে। তবে রূপলাল এমনিতে ভদ্র ব্যবহারই করে।

চা-বিস্কুট আসে।

আসার সময় বলে অনিমেষকে,

—আসবেন, বাদাবনে পড়ে থাকি। তবু আপনাদের দেখা পেলে খুশিই হবো। নমস্কার।

অনিমেষ সেদিন বুঝেছিল এখানে তাকে বাধার সম্মুখীনই হতে হবে।

হয়েছেও তাই।

আজ বিজলি বলে,

—পাবেন না কাঠ এখানে।

অনিমেষ বলে,

—তাই দেখছি।

বিজলি বলে—এই আবাদেই এলেন শেষ অবধি?

অনিমেষ বলে,

—আপনিও তো এসেছেন।

বিজলি নিজের জীবনের সেই প্রতারণার কথাটা বলতে পারে না। ওটা তার মনে এখনো জ্বালা ধরায়। বলে সে,

—আসতেই হয়েছে। আমার ইচ্ছাটা এখানে কিছুই নয়। আর এসে আটকে পড়েছি। এই বাদাবন—এই গাঙ, এখানের মানুষ সব যেন আমার জীবনকে এক শূন্যতায় ভরে দিয়েছে। মনে হয় নিদারুণ ঠকে গেছি।

অনিমেষ দেখছে ওকে।

এ যেন তার কথাই বলছে ওই মেয়েটি। অনিমেষও এখানে যেন বন্দী হয়ে রয়েছে।

বলে অনিমেষ—নিজেও ওই কথাগুলো ভাবি বিজলি দেবী। কিন্তু করার কিছুই নাই। চলি—নমস্কার।

অনিমেষ কাঠের পাটাতন বেয়ে নীচের গাঙে গিয়ে তার স্পিড-বোটে উঠল, নৌকাটা ঢেউ-এ দুলছে, ইঞ্জিনের গর্জন ওঠে।

স্পিডবোটটা বের হয়ে গেল।

বিজলি দেখছে ওকে। মনে হয় তাদের দুজনের মধ্যে কোথায় একটা মিল রয়েছে। ওই অনিমেষও তার মতই নির্বাসনে পড়ে রয়েছে এখানে।

মুক্তির কোন পথই পায়নি তারই মত।

মানুষের এই সমাজে মুক্তি মেলার কোন সুযোগই নাই।

রতন নস্কর আর কামিনীও এমনি মুক্তির সন্ধানে এই গঞ্জের পরিবেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।

দীঘায় এসে তারা এখন ভালোই আছে।

রতন ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে যায়। দিগন্তপ্রসারী সমুদ্র দিনরাত তারা ভেসে চলে মাছের ঝাঁকের সন্ধানে, তারাগুলো ঝকঝক করে আকাশে, ঘন কুয়াশায় আবার সব ঢেকে যায়। রাতের অন্ধকারে এরা চলেছে, পিছনে বাঁধা আছে নৌকা কয়েকটা।

ওরা সমুদ্রে জাল ফেলে চলেছে খানিকটা ঘিরে, লম্বা জালের স্তূপ দরিয়ায় ফেলছে, এদের মাথায় বড় বড় লাল প্লাস্টিকের বল বাঁধা। ওরাই জলে ভেসে থেকে জালকেও ভাসিয়ে রাখে।

এই জালের বৃত্তে সমুদ্রের মাছগুলো আটকে পড়ে, এবার বিশাল জাল টেনে তোলে। চকচকে মাছের স্তূপ জমা হয় ট্রলারের খোলে, মাছ আর মাছ।

ভাগ্য ভালো থাকলে দু-তিন ক্ষেপেই ট্রলারের খোল ভরে ওঠে সমুদ্রের রূপালী ফসলে। এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা।

ট্রলার ফিরে আসে।

মাছের আড়তে কর্মব্যস্ততা নামে, মালিকও খুশি। নস্থ এখন আলাদা ট্রলার চালায়। রতনও নিজে এখন সারেঙ। কোন ক্ষেপে নিরাপদেই প্রচুর মাছ ধরে ফিরে আসে আবার কোন ক্ষেপে ঝড়ের তুফানের মধ্যেও পড়ে।

তখন সমুদ্রের রূপ বদলে যায়।

মারমুখী সমুদ্র তখন উত্তাল হয়ে সবকিছুকে গ্রাস করতে চায়। তখন চলে বাঁচার লড়াই।

রতন সেই লড়াই-এ সামিল হয়েছে।

নিশানা নাই, শুধু ঢেউ আর ঢেউ—তার মাথায় মাথায় লাফিয়ে ওঠে তার ট্রলার। কোনমতেই ঘোর ছত্রভঙ্গ অবস্থায় মাছের দেখা মেলে না।

এমনি ঝড়ের রাতে পথ চেয়ে থাকে কামিনী। শুধু কামিনীই নয়, ওই জেলেবসতির মেয়ে—ছেলেরা তখন নীরবে স্তব্ধ চাহনি মেলে চেয়ে

থাকে দিগন্তের মেতে ওঠা সমুদ্রের দিকে।

রাত কাটে—ঘুম আসে না।

কবে ফিরবে ঘরের মানুষ, কেউ ফেরে—কেউ ফেরে না।

জেলে পাড়ায় ওঠে কান্নার রোল অনেকেই বলে,

—জালে আর যাবো না।

কিন্তু যেতেই হয়, সমুদ্র ওদের ডাকে। ওদের মন ঘরে বসে না; তাই যেতেই হয় আবার, মাছও ধরে।

কামিনী তিল তিল করে টাকা জমাচ্ছে।

বেশ কিছু জমিয়েছে সে গোপনে, তারও খুব সাধ নিজেদের ট্রলার কিনবে সরকারী ঋণ নিয়ে।

এখানে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে—মায় উড়িষ্যার বালেশ্বর অন্য জেলা থেকেও জেলেরা আসে। মরশুমে এখানে মাছ ভালো ওঠে ক'মাসে।

তারপর গ্রীষ্মে ওঠে কালবৈশাখী ঝড়, তবু তাতেও যায় মাঝ দরিয়ায় মাছ ধরতে, কিন্তু বর্ষায় আর যাওয়া যায়না। তখন যে যার মুলুকে ফিরে যায়।

বালেশ্বরের কিছু জেলেও এসেছে।

কামিনী-রতনের তাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে। তারা জানায় বর্ষায় তারা সুবর্ণরেখা না হয় লাগোয়া ঝিলেও প্রচুর মাছ ধরে।

রতন বলে,

কামিনী, এবার বর্ষায় বালেশ্বরের দিকেই যাবো! ওখানের বিলে তখন প্রচুর মাছ মেলে। আর দু-মরশুম মাছ ধরতে পারলে নিজেদের ট্রলার কিনতে পারবো।

কামিনীও কি ভাবছে।

তারও ওই ট্রলারের স্বপ্ন সারা মন জুড়ে।

কামিনী বলে,

—তাই চলো। বর্ষায় তো এখানে বসে যেতে হবে। ওখানে তবু কাজ করতে পারবে। রোজকারও হবে। তাই সেবার ওরা অন্যত্র

যাবার কথা ভাবে।

বর্ষা নামে দীঘায়।

তখন সমুদ্রের চেহারাও বদলে যায়। শান্ত সমুদ্র হয়ে ওঠে উত্তাল, মারমুখী, বিশাল ঢেউগুলো এসে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ে—ছিটকে জল ওঠে রাস্তার এদিকে, ওই বালিয়াড়ির বসতও উঠে যায়।

সমুদ্র মেতে ওঠার আগেই বাইরে থেকে আসা লঞ্চ ও নৌকা-গুলোও চলে যায় যে যার ঠিকানায়।

এই বালিয়াড়ির বসতও মুছে যায়।

এখানে আর কলরব জাগে না। ওঠে মত্ত ঢেউয়ের গর্জন।

কামিনীরাও এবার চলে গেছে দীঘা ছেড়ে ওই অচেনা পরিবেশে বালেশ্বরের কোন গ্রামের দিকে, সেখানেই তারা রয়েছে।

রতনও মাছ ধরার ট্রলারের কাজ পেয়েছে।

এই বিলের বিস্তারে এসময় মাছ ধরা নিরাপদ আর মাছও ওঠে মন্দ নয়।

রতন স্বপ্ন দেখে, নিজের ট্রলার হবে।

কামিনীও স্বপ্ন দেখে।

সেখ খলসেখালির গঞ্জ তার চোখে ভেসে ওঠে।

তার ভাই মদন—অন্তরা কেমন আছে জানেও না। মায়ের খবর জানে না।

খুব ইচ্ছা হয় সেখানে ফিরে যেতে।

আর সেই রূপলালকে ভয় সে করবে না। নিজেদের ট্রলার নিয়েই যাবে সেখানে। নিজেরাই মাছ ধরবে মদন অন্তুদের নিয়ে।

ওদের ধরা মাছ ট্রলারে করে ক্যানিং-এর বাজারে এনে বিক্রী করবে।

এই পরবাসে থাকতে আর ভালো লাগে না কামিনীর—বার বার তার মন টানে সেই ফেলে আসা গঞ্জের দিকেই।

বিজলি স্বপ্ন দেখে এখান থেকে চলে যাবে একদিন। ওই স্বার্থপর

রূপলালের শাসন আর মানবে না সে।

খলসেখালিতে হাটবারের দিনটা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সপ্তাহে একদিন এখানে হাট বসে, অন্যদিন গঞ্জ যেন ঘুমিয়ে থাকে, দুচারজন লোক আসে যায় ওই বন অফিসে—করাতকলে কাজ হয়, কৈলাস ডাক্তার হাটতলায় তার চেম্বার খুলে বসে থাকে। কয়েকজন দোকানদার কোন রকমে টুক টাক বেচা কেনা করে।

কিন্তু হাটবারে সকাল থেকেই গাঙের বুকে লোকজনের ভিড় সুরু হয়। নৌকা—ডিঙ্গিগুলোয় লোকজন মালপত্র নিয়ে আসে।

আসে খদ্দেরের দলও।

কলরব কোলাহলে জায়গাটা মুখর হয়ে ওঠে।

মাইকে সর্বরোগহর সালসার বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়। কাপড়-চোপড়, হাল-ফাল, বেনেতী মশালা—আনাজ, মাছ সবই বিক্রী হয় হাটে।

কৈলাস ডাক্তারের অবকাশ নেই।

জিব দেখে নাড়ি টিপে ওই লাল ওষুধ, আর পুরিয়া বিচতে থাকে, বেশি টাকা পেলে ইঞ্জেকশনও দেয়, ওপাশের একটা তমালগাছের নীচে টুল পেতে বিনোদ নাপিতের মোবাইল সেলুনে চুল দাড়ি কাটা হয়, বত্রিশ রকম মশলা খোপে খোপে সাজিয়ে নোটন নস্করের পানের দোকানও জমে ওঠে।

অনিমেষও হাটবারে আসে এখানে। ওই বন্দী জীবন, কাজ ভালো লাগে না। হাটবার কারখানা বন্ধ, সেদিন অনিমেষ এসেছে।

তার লোকজন কেনাকাটা সারছে, অনিমেষ এসেছে, ফরেস্ট অফিস, কিছু কাজকর্ম সেরে এদিকে ঘুরছে। এ-পাশটা বেশ নির্জন; গাছ-গাছালিতে সাজানো, হাটের কলরব এখানে তত বেশি নয়।

—আপনি! নমস্কার।

বিজলিও হাট ঘুরতে বের হয় এখন, তবু কিছু বাইরের লোকের মুখ দেখা যায়। বৈচিত্র্যহীন বন্দী জীবনে এই একটা দিনে বাইরের

লোক আসে, এখানে প্রাণের সাড়া জাগে।

বিজলি ঘুরে ফিরে এই শান্ত নির্জনে গাঙের ধারে বেঞ্চে এসে বসে, ওই গাঙ একদিকে চলে গেছে মহানগরের দিকে, সভ্য জগতের দিকে আর দক্ষিণে গিয়ে ঢুকেছে সুন্দরবনে—তারপর গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে।

হাওয়া ফুঁসছে—বাতাসে ওঠে ঢেউয়ের গর্জন।

অবিরাম সে কি নিষ্ফল আক্রোশে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ছে, যেন বিজলির বুকেও অমনি ঢেউয়ের গর্জন চলেছে।

—আপনি!

বিজলি অনিমেষকে এখানে দেখবে ভাবেনি।

বিজলি বলে—হাটে এসেছিলেন?

অনিমেষ বলে—সপ্তাহে একদিন তবু কিছু বাইরের লোকের মুখ দেখতে পাই এখানে, তাই আসি, বড় একঘেয়ে লাগে।

বিজলি বলে—সত্যি, এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে, বন্দীদের মত যেন কয়েদখানায় আটকে থাকি।

অনিমেষ দেখছে বিজলিকে।

বিজলি বলে—তবু আপনি তো ঘোরাফেরা করেন—

—করতে হয়।

—কলকাতাতেই বাড়ি?

অনিমেষ হাসে।

—হ্যাঁ, ওখানে থাকতে কলকাতার নামে হাঁপিয়ে উঠতাম, এখানে এসে সেই কলকাতার জন্য মন কেমন করে, বিজলির চোখে ভেসে ওঠে অতীতের ছবি।

কলকাতার আলোভরা রাত্রি—কতদিন, কর্মব্যস্ততা—যাত্রার মহড়া, থিয়েটার ক্লাবের সেই আড্ডা—কাগজে নাম ছাপা সে সব কোন দিকে হারিয়ে গেছে।

বিজলি বলে—কতদিন কলকাতায় যাইনি।

অনিমেষও বেঞ্চে বসেছে।

এর মধ্যে সেও ওই বিজলির সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছে, এখানে

সবাই সকলের হাঁড়ির খবর জানে।

অনিমেষ বলে—কলকাতার স্টেজে যাত্রায় অভিনয় করতেন, নাম-ডাকও হয়েছিল, ওসব ছেড়ে এখানে এভাবে অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন ভেবে আশ্চর্য লাগে।

বিজলি শুধোয়—এসব কোথা থেকে জানলেন?

অনিমেষ বলে—গোলাপফুল কি তার সুগন্ধকে লুকোতে পারে?

বিষণ্ণ হাসি হাসে বিজলি। বলে,

—গোলাপফুল নয়, বলুন ঘেঁটু ফুল।

অনিমেষ বলে—এ আপনার ভুল ধারণা, নিজেকে হয়তো নিজেই চেনেননি তাই এভাবে সেই জীবন থেকে এখানে এসে তৃপ্ত হয়েছেন।

বিজলির সারা মন আজ হাহাকার করে ওঠে। বলে সে—না। এ আমার নিজের ভুল নয়। দুর্ভাগ্য, নাহলে কোথা থেকে কোথায় এসে আটকে পড়েছি। বিজলি জানে অনিমেষও রূপলাল মান্নার প্রতিপক্ষ। ওই সাহসী সৎ যুবকটিকে সে বিশ্বাস করে। আজ তাই বলে বিজলি,

—এ আমি চাইনি, কিন্তু একটা স্বার্থপর হিংস্র মানুষের চক্রে পড়ে এখানে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি, জানিনা এই জাল থেকে কোন-দিন মুক্তি পাবো কিনা, মনে হয় সেই কলকাতাতেই ফিরে যাই, ফিরে যাবো সুর-আলো-প্রাণভরা সেই জীবনে, কিন্তু মুক্তির পথ দেখিনা। খাঁচায় বন্দী পাখীর মত খাঁচার লোহাতেই মাথা ঠুকে মরছি—

অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে শুনছে ওই বিজলির কথা।

আজ বুঝেছে সে, ওই মেয়েটির জীবনে কত জ্বালা-গ্লানির হাহাকার জমে আছে। ঢেউগুলো তীরভূমিতে সশব্দে আছড়ে পড়ছে ব্যর্থ আক্রোশে।

রূপলাল তার নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত।

তার কাছে মেয়েরা আরও পাঁচটা আসবাবের মতই। তার প্রভুত্বের পরিচয় ওরা। এর বেশি আর কিছু নয়। তাই বিজলির দিকে চাইবার

মত সময় তার নাই।

বিজলি এবার কথাটা ভাবছে।

তার মধ্যে হাটবারে দু-একবার অনিমেষের সঙ্গে দেখাও হয়েছে।

দুজনে ওই বনের আড়ালে বসে নিজেদের জীবনের সুখ দুখের অনেক কথাই বলেছে, দুজনের বন্দীমন যেন এক সুরে বাঁধা পড়েছে।

বিজলি বলে—তোমাদের কারখানাও দেখিনি।

হাসে অনিমেষ, জানে সে এখন কারখানা তাদের লোকসানেই চলছে। কারণ ওই রূপলালই।

তার চাপেই বনবিভাগও তাদের কারখানাকে বিশেষ পারমিটও দেয় না। ফলে কাজ কাম গেছে।

অনিমেষ বলে—দেখার মত কিছুই নাই।

—না নিয়ে যাবেনা আমাকে? বলে বিজলি,

এখন তারা আপনির বাধা ছাড়িয়ে দুজনে সহজ হয়েছে অনেক। বিজলিই বলে—মাঝে মাঝে বের হতে বড় ইচ্ছা হয়।

বিজলি এবার কিছুটা সাহসীই হয়েছে। মেয়েরা ক্রমশ মনে সাহস আনতে পারে সহজেই। বিজলিও তেমনি আগেকার সেই বেপরোয়া মনটাকে যেন খুঁজে পেয়েছে।

দেখছে সে, রূপলাল ইদানীং নানা কাজে বসিরহাটে যাচ্ছে, জেলা-সদরেও যেতে হয়, আর কলকাতাতেও যায়।

ইদানীং তার সেই রাতের কারবার জোর চলছে। রাতে লঞ্চ আসা যাওয়া করে বর্ডার থেকে মালপত্র নিয়ে, সনাতনও ওসব কাজে ব্যস্ত।

বসিরহাটের দিকেও লঞ্চ নিয়ে যায়, গঞ্জের বাড়িতে একাই থাকে বিজলি, দিন কাটে না তার।

সে এখন ওদের এইসব আনাগোনার খবরও রাখে, বিজলিই বলে অনিমেষকে,

—এই রবিবার চলো তোমার ওখানে যাবো।

অনিমেষ দেখছে বিজলিকে।

বাদাবনে এসে বন্দী ওই মেয়েটিকে দেখে সেও বিস্মিত হয়েছিল,

ক্রমশ জেনেছে বিজলির সব কথাই।

একটা লোভী স্বার্থপর মানুষের চক্রান্তে বিজলি বন্দী হয়ে এইভাবে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, মেয়েটির জন্য সমবেদনাই জাগে, ও চায় •একটু মুক্তির স্বাদ।

বিজলি বলে,

—কি হলো? জবাব দিচ্ছনা যে, ভয় হচ্ছে নাকি!

অনিমেষের পৌরুষেই ঘা লাগে।

সেও জানে রূপলালকে। লোকটা তার প্রতিষ্ঠা হারাতে চায় না, আর অনিমেষও দেখছে রূপলাল ওকে হাবে ভাবে প্রকারান্তরে শাসিয়েছে।

বলেছিল—আমার করাতকলেই আসুন—

কিন্তু অনিমেষ ওই লোকটার অধীনে কাজ করতে চায় না। তাই বলেছিল—এখানেই বেশ আছি।

রূপলাল বলে কঠিন স্বরে,

—ও কারখানা থাকবে না।

অনিমেষ বলে—থাকুক না থাকুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কোম্পানীর অনেক ব্যবসা আছে নানা জায়গায়, সেখানেই চলে যাবো কোথায়।

—তাহলে সেই চেষ্টাই করুন, রূপলাল শোনায়—এখানে থাকা ঠিক হবেনা।

অনিমেষ বলে—ভেবে দেখবো কথাটা। চলি, নমস্কার।

অনিমেষ রূপলালকে পাত্তা দেয়নি। আর রূপলালও চেষ্টা করেছে নানাভাবে তাদের কারখানা বন্ধ করতে। কখনো শ্রমিক অশান্তি—কখনো চালানের নৌকাও লুঠ হয়ে গেছে, কাঠও পায়নি তারা।

তবু অনিমেষ দমেনি, তাই বিজলির কথায় বলে,

—ভয় থাকলে কবে চলে যেতাম এখান থেকে।

বিজলি বলে,

—তা জানি। তাই তো তোমার উপর বিশ্বাস হয়।

জানায় বিজলি—কাল থেকে তিন চারদিন বাড়িতে একা। মামা-মশাই নাকি কলকাতায় যাচ্ছে, তাই বলছিলাম।

অনিমেষের স্পিডবোটটা চলেছে গাঙের বুক চিরে, হাওয়ায় ওড়ে বিজলির শাড়ির আঁচল। অনিমেষ দেখছে ওকে। বোটটা এসে বড় নদী ছেড়ে ছোট খাল ধরে অনিমেষের করাত কলের জেটিতে গিয়ে থামলো।

বিজলি নেমেছে।

আগে এদিকে সে আসেনি। জায়গাটা খলসেখালির গঞ্জের তুলনায় অনেক ছোট, আর বেশ শান্ত, বেশ কিছু প্রাচীন বিশাল রেইনট্রি গাছ জায়গাটাকে ছায়াঘন করে রেখেছে।

কারখানার ওদিকে ছোট একটা কাঠের বাংলো। চারপাশে কিছু ছোট ছোট নারকেল গাছ, দু-চারটে ফুলের গাছও রয়েছে।

বড় একটা দ্বীপই বলা যেতে পারে, এর শেষ মাথায় খলসে খালি গঞ্জ—আর এক প্রান্তে এই পুঁইজালির গঞ্জ। একে ঘিরে রয়েছে বড় নদী। আর হেঁটেও ওই নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে যাতায়াত করে মানুষ।

সরু পথ, বর্ষাকালে চলার অযোগ্য হয়ে ওঠে কাদায়, মাইল ছয়েকের পথ। নদী পথে আসাই আরামের।

অনিমেষের বাংলোয় ঢুকে বিজলি দেখে বেশ কিছু বইপত্র ছড়ানো। একটা রেডিও রয়েছে। ফুলদানিতে কোন্ কালের রাখা ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে।

বিজলি বলে—না! ব্যাচেলারের ঘর, তা ঢুকেই বুঝেছি।

—কেন?

হাসে বিজলি।

—ছন্নছাড়া পুরুষের পরিচয় পেতে দেরি হয় না।

—তাহলে ছন্নছাড়াই? হাসে অনিমেষ।

অনিমেষ এর মধ্যে চা-বিস্কুট আর কিছু রসগোল্লার ব্যবস্থাও করেছে। বিজলি বলে,

—ডিম নেই? দেখি—

নিজেই কিচেনে ঢুকে এবার ডিমের ওমলেট বানায়।

অনিমেষ বলে,

—নিজে কষ্ট করবে?

হাসে বিজলি।

—কষ্ট কি! কতদিন কর্তাকে কিছু করে খাওয়াইনি।

—সেকি! অবাক হয় অনিমেষ।

তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা যে বিচিত্র তা বুঝেছে অনিমেষ।

বিজলি বলে,

—মান্নাবাবু, কখন আসে যায় খায় ওসব খবর রাখা যায় না! নিজের মহলেই থাকে নিজের কাজ নিয়ে, সেখানে আমার যাবারও হুকুম নাই।

অনিমেষ বলে—বিচিত্র!

বিজলি আজ এই সোনা রোদ ভরা বিকালে যেন ক্ষণিক পাওয়ার কি সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। তাই নিয়েই সব দুঃখ বঞ্চনাকে ভুলতে চায় সে।

অনিমেষও এক নতুন বিজলিকে আবিষ্কার করে। তারও মনে হয় কোথায় যেন অনিমেষ ধরা পড়ে গেছে।

এই বন্দী মেয়েটির জন্য দুঃখবোধ হয় তার।

ওই রূপলালের মত নিষ্ঠুর স্বার্থপর লোককে সে ক্ষমা করতে পারে না।

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা তিথিই।

নদীতে ভরা জোয়ার। চাঁদের আলোয় যেন রূপালী প্লাবন নেমেছে নদীতে।

স্পিড বোটটা নিয়ে ফিরছে অনিমেষ বিজলিকে পৌঁছে দিতে।

আজ বিজলির হাতটা ওর হাতে।

কি যেন গুণগুনিয়ে গান গায় বিজলি। অনিমেষ সেই সুরের

রাজ্যে হারিয়ে গেছে।

বিজলি খুশিতে গান গায়।

তার প্রিয় সেই গান।

—জীবনের পরম লগন—

করোনা হেলা, হে গরবিনী—

বৃথাই কাটিবে বেলা

সাঙ্গ হবে যে খেলা—

অনিমেষ আজ এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যায়।

বিজলি যেন তার এই বন্দী জীবন থেকে এবার মুক্তির স্বপ্ন দেখে ওই অনিমেষকে কেন্দ্র করে।

রূপলাল তার নিজের জগৎ নিয়েই ব্যস্ত।

সে ওই বনবিভাগকে চাপ দিয়ে অনিমেষদের করাতকলকে গাছ দেওয়া কমিয়ে এনেছে। ফলে প্রডাকশন কম হচ্ছে তাদের।

তবু কিছু মাল তৈরি করে তারা বড় নৌকায় করে কলকাতায় চালান দেয়। কিন্তু সেই মাল ঠিকমত পৌঁছছে না।

বিস্তীর্ণ নদী, নৌকা চলেছে।

রূপলাল জানে কি করে আঘাত করতে হয়। সনাতন এসব কাজে খুবই নিপুণ।

রাতের অন্ধকারে তারা এসে হানা দেয় কোম্পানীর নৌকায়।

মাঝিদের বেঁধে মারধোর করে সব কেড়ে নেয়। ওই সব কাঠের পেটি নৌকায় করে এনে তাদের বাক্সগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে চালান দেয় মান্নাবাবু।

ওই করাতকলের মাল এইভাবেই বরবাদ করে চলেছে রূপলাল, বিদেশী কোম্পানীর কর্তারা ওই করাতকলের লোকসানের বহর দেখে এবার বিপদে পড়ে। বেশ ক'বছর ধরেই লোকসান চলেছে।

তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় ওই করাতকল তারা তুলে দেবে। তাদের শিলিগুড়ি, আসামেও করাতকল আছে। সেগুলোই বাড়াবে। ওই

বাদাবনের কল বন্ধ করার কথাই ভাবছে। আর খবরটাও ঠিক এসে যায় রূপলালের কানে। তার প্রতিষ্ঠায় এসে থাবা বসাতে চেয়েছিল, ওই অনিমেষবাবু এবার তার দাপটও কমবে।

রূপলাল আরো একদমক এগোতে চায় এবার। সেইই কোম্পানীকে প্রস্তাব দিয়েছে ওই কারখানা তাকেই লীজ দেওয়া হোক—সে কোম্পানীকে তাদের চাহিদামত একটা নির্দিষ্ট দরে চায়ের বাক্স সাপ্লাই করবে।

কর্তারাও হিসাব নিকাশ করে দেখেছে তাদের মিল ওখানে কেউ কিনতেও যাবেনা। আর ওই রূপলাল মান্না ছাড়া ওখানে কেউ প্রডাকশনও করতে পারবেনা। বাদাবনের সেই অলিখিত সম্রাট।

তাই তারা দেখেছে এতে তবু কিছু টাকা তাদের উঠে আসবে নাহলে করাতকল ওখানেই পড়ে শেষ হয়ে যাবে।

সেইসব কথা পাকা করার জন্যে তারা রূপলালকে কলকাতায় ডেকেছে।

রূপলালের চিঠিপত্র কিছুটা বিজলিও দেখে। তাই সেও জানে রূপলাল কলকাতায় যাবে।

কদিন তাই বিজলিও মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সেও স্বপ্ন দেখে ওই অনিমেষই পারে তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে।

রূপলাল বেশ খুশি মনেই ফেরে কলকাতা থেকে। এবার ওই করাত-কলেরই মালিক হবে সে। তাই এর মধ্যে নিজেও গেছে রূপলাল অনিমেষের করাতকলে।

অনিমেষও খবর পেয়েছে কোম্পানী এই করাতকল নিজেরা আর চালাবেনা।

তারা এটা রূপলালবাবুকেই 'লীজ' দেবে।

তাই অনিমেষকে তারা কলকাতা অফিস থেকে লিখেছে সে যেন রূপলালবাবুকে করাতকলের মালপত্র লিস্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে সাত-

দিনের মধ্যে শিলিগুড়ির ওদিকে কোম্পানীর মাটিগোড়ার কাছে তাদের করাতকল টিম্বার ডিপোয় গিয়ে জয়েন করে।

অনিমেষও মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

এই পাণ্ডব বর্জিত দূর আবাদ অঞ্চল থেকে সে এবার মানুষের জগতে, মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাবে এই জল জঙ্গল থেকে।

রূপলালবাবু এসেছে তাদের করাতকলে, সঙ্গে তার চিরসহচর সনাতনও রয়েছে। আজ রূপলাল যেন ভাবী মালিকের মত দম্ভ নিয়েই আসে এদের মিলে।

করাতকলের অফিসে বসে খাতাপত্র দেখতে দেখতে বলে রূপলাল।

—কি অনিমেষবাবু, আমি বলিনি এই করাতকল আমার হাতেই আসবে।

অনিমেষ জানে আসার কারণগুলো। তাই সে বলে,

—এসব হলে আর না এসে কি চলে?

সনাতন চমকে ওঠে। ওইসব কর্মের হোতা সে। তাই শুধোয়,

—মানে?

অনিমেষ জবাব দিল না। এবার রূপলাল বলে,

—তবে আপনার চাকরী 'নট' করব না। যে মাইনে পাচ্ছেন পাবেন, আমার কথামত কাজ করতে হবে মাত্র, তাহলেই থাকতে পারবেন এখানে।

তারপর সনাতনের মতামত নেবার জন্যই শুধোয় রূপলাল।

—কি বলো সনাতন?

অনিমেষই জানায়,

—কিন্তু এখানে থাকছি না।

রূপলাল শুধোয়,

—কেন? চাকরী ছেড়ে দেবে? আজকালকার দিনে এই চাকরী কেউ ছাড়ে? থেকে যাও হে ছোকরা—মালিক আমি খারাপ নই। তবে ফাঁকি দিইনা, চুরিও করিনা।

তাই ফাঁকিবাজ আর চোরদের দেখতে পারিনা।

সনাতন বলে,

—ওসব করলে তাকেও সযুত করে দিই।

অনিমেষ বলে—তা ভালোই। তবে আমি তো আপনার চাকরী করছি না।

কোম্পানীর চাকরী করি। তারা আমাকে এখানে—আপনাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে অন্যত্র যেতে বলেছে।

রূপলাল হতাশ হয়, একটা অবাধ্য লোককে জব্দ করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল—বলে সে,

—তাই নাকি!

অনিমেষ বলে,

—সেখানে অবশ্য আপনার মত সৎ লোক নেই, তাই ওখানের কারখানা পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে, এখানের মত শেষ হয়ে যায়নি।

পরক্ষণেই ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে সে,

—চলুন, যন্ত্রপাতি—কাঠের স্টক এসব দেখেশুনে নিয়ে সই করে দেবেন, তারপর যা হয় করবেন, আমাকে সাত দিনের মধ্যে এসব চুকিয়ে যেতে হবে।

অনিমেষকে ধাতে আনতে পারেনি রূপলাল।

সে তার ব্যক্তিত্ব নিয়েই ওদের কারখানার যন্ত্রপাতি, স্টক এসব দেখাতে থাকে।

বলে সে—আমি লিস্ট করে রাখছি, কাল এসে এসব বুঝে সই করে দেবেন, নমস্কার।

ওদের বিদায় করে অনিমেষ।

লঞ্চে ফিরছে রূপলাল আর সনাতন।

রূপলাল বেশ গম্ভীর, ভেবেছিল ওই তেজী তরুণটিকে তার চাকর বানিয়ে ওকে দুরস্ত করে তার প্রতিষ্ঠা দেখিয়ে দেবে, কিন্তু তা হয়নি।

অনিমেষ মাথা উঁচু করেই চলে যাবে এখান থেকে।

ওই লোকটার কাছে রূপলাল হেরে গেছে, সনাতনও খুশি নয়, বলে সে,

—ব্যাটার তেজ দেখলে কর্তাবাবু! শালা যেন লাটসাহেব।

রূপলাল কথা বলে না।

সনাতন বলে—দোব ওকে একটু ওষুধ?

রূপলাল জানে কোন গোলমাল হলে কোম্পানী যদি বিগড়ে যায়, এসব হাতে আসবে না। তাই বলে,—না। ওসবে দরকার নাই। মাল হাতে আসছে এই ঢের। চেপে যা।

সনাতন বাধ্য হয়ে চুপ করে যায়।

বিজলিও খবরটা পেয়েছে।

ওই করাতকলের দখল নিচ্ছে রূপলালই। এই আবাদের সর্বকিছুই যেন সেইই দখল করবে।

বিজলিও ভাবনায় পড়ে।

সেদিন অনিমেষও তাকে এমনি একটা আভাষ দিয়েছিল।

এই কারখানা কোম্পানী রাখবে না। বিজলি বলে,

—তাহলে তুমি! তুমি কি করবে?

হাসে অনিমেষ।

—কোম্পানী আমাকে শিলিগুড়ির ওদিকে কোন কারখানায় বদলি করবে।

চমকে ওঠে বিজলি। —তুমি চলে যাবে এখান থেকে?

—হ্যাঁ!

বিজলি বলে—তুমি মুক্তি পেয়ে গেলে, কিন্তু আমি! আমাকে এই বাদাবনে ওই শয়তানের খাঁচাতে বন্দী হয়েই থাকতে হবে, এ ভাবে আমি বাঁচবো না অনিমেষ!

অনিমেষ দেখছে বিজলিকে, ওর দুচোখে বেদনার অশ্রু।

বিজলি বলে—এই গাঙে ডুবেই একদিন আত্মঘাতী হতে হবে অনিমেষ। ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে আর পারছিনা।

অনিমেষ কি ভাবছে।

বিজলি বলে,—তুমি কি বাঁচাতে পারোনা আমাকে ওই শয়তানের

হাত থেকে অনিমেষ!

অনিমেষ এর কি জবাব এখুনি দেবে জানেনা। বলে সে, —একটু ভাবতে দাও বিজলি।

বিজলি সেদিন ফিরে এসেছে।

দেখে সেদিন ওই রূপলাল মান্নার ওই মহলে খুবই আনন্দ উৎসব চলছে।

ওই করাতকল জলের দরে দখল করেছে রূপলাল তাই চ্যালাদের স্তাবকদের বেশ ধুমধাম করেই আজ ভোজ দিচ্ছে সে।

বিজলিও শুনেছে খবরটা।

করাতকলের ম্যানেজারবাবুকে রাখতে চেয়েছিল রূপলাল কিন্তু সে রাজী হয়নি।

চলে যাচ্ছে অনিমেষ এখান থেকে এই ভোরের লঞ্চেই।

বিজলি কি ভাবছে।

বাইরে বাড়ি থেকে মত্তপ কণ্ঠের হৈ চৈ ভেসে আসে। ফণী দারোগা, বসন্ত গোলদার বনবাবুও রয়েছে। সনাতন খুবই ব্যস্ত।

বাতাসে মদের খোসবু ভেসে আসে।

ওদিকে মালোপাড়ার সুন্দরীকে আনা হয়েছে। মেয়েটা নাচ গানও জানে।

আজ তার খেমটা নাচও হবে।

বিজলি ভাবছে তার জীবনের শেষ আশাটুকুও হারিয়ে যাবে।

এ-ভাবে বন্দী হয়ে, এই নরকের মধ্যে থাকতে সে পারবেনা। হয় নতুন করে বাঁচবে, না হয় শেষই হয়ে যাবে।

ওদিকে সবাই ব্যস্ত।

বিজলি আজ তার সিদ্ধান্ত নেয়।

তাড়াতাড়ি সে একটা ছোট ব্যাগে সামান্য কাপড় চোপড়, কিছু গহনা-টাকা যা এখানে ছিল নিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে আবছা অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসে।

ভেড়ির এদিকটা অন্ধকার।

এ-সময় এদিকে কেউ থাকেনা। বিজলি ওই বাড়িটার দিকে চাইল। আজ এই বন্দীশালা থেকে ওই স্বার্থপর মানুষটার কাছ থেকে সে দূরেই পালাবে।

চলেছে সে ভেড়ির পথ ধরে।

একদিকে গাঙ—তখন জোয়ারে থৈ থৈ করছে। তারাগুলো ঝিকমিক করে। ওদিকে বনের বিস্তার।

এমনি রাতে বন থেকে বাঘও বের হয়ে আসে রাতের অন্ধকারে শিকারের সন্ধানে।

বিজলির আজ বনের বাঘকেও ভয় নেই। সাপের রাজত্ব—রাতের হিমে তারাও শিকারের সন্ধানে বের হয়। বিজলি আজ তাদের ভয় করে না।

ভয় তার ওই মানুষটাকে—যে বাঘের চেয়েও হিংস্র, সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

পালাচ্ছে সে। পিছনে পড়ে রইল খলসেখালির গঞ্জ। স্তব্ধ রাত্রি।

বাতাসে ঢেউয়ের গর্জন ওঠে, ওই অন্ধকারেই পালাচ্ছে বিজলি। এই তার শেষ সুযোগ। অনিমেষ এখনও যায়নি।

আজ ভোরেই চলে যাবে লঞ্চে।

তার আগে তাকে ধরতেই হবে। হাঁটতে পারছে না—তবু সাবধানে সে ওই ভেড়ির পথরেখা ধরে চলেছে।

ছুটছে—হাঁপাচ্ছে সে। বুকে যেন ঝড় উঠছে। তবু যেতেই হবে তাকে।

অনিমেষ এখানের কাজ শেষ করে এবার যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সামান্য জিনিষ। কিছু বই—আর কাপড় চোপড় সব ব্যাগে পোরা হয়ে গেছে।

ভোর চারটেতে সার্ভিস লঞ্চ ছাড়ে—তাতে যেতে দেরী হবে, অনেক থামতে থামতে যাবে। তাই নিজেদের স্পিডবোট নিয়েই যাবে একটু ফরসা হলে।

রাতে ঘুম হয়না অনিমেষের।

অনিমেষের বারবার মনে পড়ে একজনের কথা।

সে ওই বিজলি।

বিজলির সেই কাতর কণ্ঠস্বর ভোলেনি। জানে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে ওই মেয়েটি। অনিমেষকে বার বার বলেছে, কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। এ যেন তার দুর্বলতাই। একটা পরাজয়কে স্বীকার করেই তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে চাইল অনিমেষ। দরজাটা খুলেই বিজলিকে দেখে চমকে ওঠে অনিমেষ।

—তুমি!

হাঁপাচ্ছে বিজলি। চোখ মুখে উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি! ওর চুল এলোমেলো। টেবিলে রাখা গ্লাসের জলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বিজলি বলে,

—আমাকে বাঁচাও অনিমেষ। তোমার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমাকে শুধু বসিরহাট পৌঁছে দাও।

আমাকে নাহলে মরতেই হবে—আর ফিরবো না ওখানে। তুমি না নিয়ে যাও—গাঙে ডুবেই শেষ করে দেব নিজেকে।

—বিজলি! অনিমেষ দেখছে ওকে।

আজ অনিমেষও যেন এই চেয়েছিল। বিজলিকে সেও মনে মনে ভালোবেসেছিল। আজ ওকে এইভাবে চলে আসতে দেখে অনিমেষের মনে হয় এটাই সে চেয়েছিল।

বলে অনিমেষ,

—তোমাকে ফেরাতে পারবোনা বিজলি। তুমি যাবে—আমার বোঝা নয়, আমার জীবনসাথী হয়েই থাকবে।

আজ বিজলি অনিমেষের বুকে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেয়। এমনি একটা অবলম্বনই সে খুঁজেছে এতদিন।

অনিমেষ কি ভাবছে।

সেও চেনে ওই রূপলালদের। তাই বলে,

—বিজলি। তাহলে আর দেরী করা ঠিক হবেনা। এখুনিই বের

হয়ে পড়তে হবে।

বিজলিও তা জানে।

ওই লোকগুলো হায়নার জাত। ওদের বিশ্বাস নাই।

যে ভাবে হোক ওদের এলাকার বাইরে তাদের পালাতেই হবে যত শীঘ্র সম্ভব।

তাই সেও বলে, —তাই ভালো অনিমেষ। আর দেরি করা ঠিক হবেনা।

রূপলালের চোখে নেশার ঘোর।

নেশা তার হয়না। সব প্রবৃত্তিগুলো আরও তীক্ষ্ণ, সজাগ হয়ে ওঠে।

ওদের হৈ চৈ পান ভোজন চলেছে।

সুন্দরী মালো নাচছে। ওর যৌবন-উচ্ছল দেহটা কেঁপে ওঠে—দর্শকদেরও বুক কাঁপে।

রূপলাল দেখছে, কে বলে—মান্নামশাই, বিজলি যাত্রার দলে দারুণ নাচতো।

রূপলালের খেয়াল হয়। বলে সে,

—আজও নাচবে। এ্যাই সনাতন—ডাক, ডাক ওই বিজলিকে। দুঢোক মদ গিলিয়ে দে—দেখবি ওটা নাচ শুরু করবে। আর ও:ক বলবি আমি ডাকছি।

—যদি না আসে?

সনাতনের কথায় রূপলাল হুকুম দেয়,

—ওর বাপ আসবে। না আসে চ্যাঙদোলা করে তুলে আনবি। কি করে সে এখানে? নাচবে না? যা।

রূপলাল মদ গিলতে থাকে।

এর কিছুক্ষণ পর সনাতন এসে খবর দেয়,

—মালিক, বিজলি তো নাই।

—সেকি! গেল কোথায়? খোঁজ—

খোঁজাখুঁজি করতে দেখা যায় পিছনের দরজা খোলা।

ওই পথেই মেয়েটা রূপলালের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

এবার রূপলাল গর্জে ওঠে,

—আমার জাল কেটে এই মুলুক থেকে পালাবে?

কার সঙ্গে যাবে? এ্যাই, সোনা,

সনাতন এসব বিষয়ে কিছু খবরও রাখে। এর আগে সে অনিমেষের সঙ্গে হাসি তামাসাও করতে দেখেছে।

রূপলাল গর্জায়,

—কি রে বোবা মেরে গেলি? ও যেতে পারে কার সঙ্গে?

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল এতদিন? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। বল—কে নে যেতে পারে?

সনাতন বলে।

—মনে হয় ওই করাতকলের ম্যানেজারটার সঙ্গেই ভেগেছে। ওর সঙ্গে ঘুরতো শুনেছি।

—আগে কেন বলিসনি? দুটোকেই খতম করতাম। আমার সঙ্গে গদ্দারি! রূপলাল হুঙ্কার ছাড়ে।

সনাতন বলে,

—এখনও বেশি দূর যেতে পারেনি। হয়তো বাসাতেই আছে দুটোতে।

রূপলাল এবার ঘরের র‍্যাক থেকে বন্দুক আর কার্তুজের বেল্টটা তুলে নেয়। বন্দুক দিয়ে অনেক কিছুই করেছে সে। আজ আবার ওই বন্দুকটাকেই তুলে নিয়ে বলে—চল। দেখি ব্যাটাকে—যদি সত্যি হয় তাহলে এবার দুটোর ব্যবস্থাই করবো।

রাতের অন্ধকারে ওদের স্পিডবোট চলেছে।

ছোট খাল থেকে বড় গাঙের দিকে আসছে অনিমেষ তার বোট নিয়ে, বিজলি চুপ করে বসে আছে। আজ সে মুক্তির স্বপ্ন দেখে এত-দিন পর। নতুন করে বিজলি ঘর বাঁধবে একজনকে নিয়ে।

অনিমেষ তাকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

হঠাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে সার্চলাইটের জোরালো আলোর রেখাটা এসে পড়ে তাদের বোটের উপর। চমকে ওঠে বিজলি।

সামনে এগিয়ে আসছে লঞ্চটা।

অনিমেষও দেখছে লঞ্চটাকে।

রূপলালের গর্জন শোনা যায়—রোখো—বোট রোখো। নাহলে গুলি করে উড়িয়ে দেব বোট।

শূন্যদিগন্তে রাতের আবছা অন্ধকারে ওর হিংস্র কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

—অনিমেষ! বিজলি চমকে ওঠে।

যে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল সেই শয়তান এইভাবে তাদের পথ আটকে দাঁড়াবে তা ভাবতেও পারেনি।

লঞ্চটা এসে ওদের বোটের গায়ে ঠেকেছে।

এবার বের হয়ে আসে রূপলাল, হাতে বন্দুক। বলে সে,

—বাঃ ম্যানেজারবাবু, আমাকে টেক্কা দিয়ে এখান থেকে চলে যাবে আমার মেয়েমানুষকে নিয়ে? বাদাবনের বাঘকে চেননি?

অনিমেষ বলে,

—কাউকে বন্দী করে রাখার অধিকার আপনার নেই।

বিজলিও বলে,

—আমি তোমার পুতুল নই যে—যা খুশি করবে। আমার ইচ্ছা আমি থাকব না, চলে যাবো এখান থেকে।

রূপলাল হেসে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—না। যাবার অধিকার তোমার নেই। তোমাকে কিনেছি।

অনিমেষ বলে,

—আপনি ওকে আটকে রাখতে পারেন না। আমিই সদরে গিয়ে রিপোর্ট করবো যে একটি মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আটকে রেখেছেন।

এবার রূপলাল গর্জে ওঠে

—এত বড় সাহস তোমার? এই বাদাবনে আমার কথামতই

চলতে হবে।

—ওই সদর শহর আপনার বাদাবন নয়।

এই অত্যাচারের প্রতিকার করবোই।

—তাই নাকি! তাহলে সেখানে পৌঁছবার পথই বন্ধ করতে হয় দেখছি তোমার।

এবার রূপলাল বন্দুক তোলে।

জানে বিজলি ওই দানবটাকে। ও অনায়াসে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষকে খুন করতে পারে, ও অনিমেষকে তার এলাকার বাইরে যেতে দিতে চায় না।

নিজের যা হয় হোক বিজলি চায় না তার জন্য অনিমেষ বিপদে পড়ুক। তাই চীৎকার করে বিজলি অনিমেষের সামনে গিয়ে ওই লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

চীৎকার করে বিজলি,

—খবরদার ওকে কিছু বলবেনা। যা বলার আমাকে বলো। ওর কোন দোষ নাই। আমিই চলে এসেছি। যেতে দাও আমাকে।

এবার রূপলাল বলে,

—এত পিরীত। আজ দেখছি তোদের—

বিজলিকে টেনে সরাতে যাবে, বিজলিও যাবে না।

রূপলাল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বিজলির কোমরে প্রচণ্ড আঘাত করতে ছিটকে পড়ে বিজলি নৌকার খোলে, চোখের সামনে অন্ধকার নামছে, সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। তার মাঝেই শোনে বন্দুকের গুলির শব্দ—আগুনের ঝলক।

কে আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে গাঙের বুকে।

রূপলাল মান্না দেখছে লঞ্চের আলোয় অনিমেষের রক্তাক্ত দেহটা গাঙে ছিটকে পড়েছে আর রক্তের স্বাদ পেয়ে এসে জুটেছে কামটের ঝাঁক—তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ওর দেহের মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

হেসে ওঠে রূপলাল। বলে সে,

—যা ব্যাটা ম্যানেজার, এবার উপরে গে রূপলালের নামে রিপোর্ট

করগে।

সনাতন বলে,

—কর্তা লাশটার গতি করে দিই?

রূপলাল বলে,

—তোকে কিছুই করতে হবে না, যা করার ওই কামটের ঝাঁকই করে দেবে, হাড় ক'খানা গাঙের অতলে তলিয়ে যাবে। চল—

পালাতে পারেনি বিজলি।

ওর অচেতন দেহটাকে তুলে আনে রূপলাল, পরদিন সকালে কৈলাস ডাক্তারও আসে।

যন্ত্রণায় ছটফট করছে বিজলি।

কৈলাস বলে—কোমরের হাড়ই ভেঙেছে মনে হয়, ভোগাবে, একে বরং শহরে নিয়ে গেলেই ভালো হবে।

রূপলাল এই এলাকার বাইরে ওকে পাঠাতে চায় না, ও সুযোগ পেলেই সদরে পুলিশকে কিছু বলবেই, ও রূপলালের অনেক কুকীর্তির খবরই জানে, তাই ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

রূপলাল বলে—তুমিই ঘ্যাখো, দরকার হয় বসিরহাট থেকে হেমন্ত ডাক্তারকে আনছি, এখানেই ওর চিকিৎসা করতে হবে।

কৈলাস তার জ্ঞানমত চিকিৎসা করতে থাকে।

বলে—সেরে উঠতে সময় নেবে, আর পুরোপুরি সুস্থ হবে বলে বোধ হয় না, একটা পা টেনেই চলতে হবে।

বিজলি বিছানাতেই রয়েছে।

তার দেহেই আঘাতটা বাজেনি, বেজেছে তার মনেও।

কোনমতে সুস্থ হয়ে উঠলেও তার চোখে ভাসে সেই বিভীষিকার রাত্রি। রূপলালকে সে ভয় করে।

ও মানুষ নয়—যেন একটা দৈত্য। যে কোন মুহূর্তে তাকেও শেষ করবে। দুর্বিসহ জীবনের বোঝা বয়েই চলেছে এখন বিজলি।

বেশ ক'টা বছরই কেটে গেছে। খলসেখালির গাঙ দিয়ে অনেক জোয়ার-ভাটা বয়ে গেছে। রূপলালের চুলে এবার দু-চারটে রূপালী রেখা দেখা যায়। বলিষ্ঠ দেহে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু হয়েছে।

কিন্তু তেমনি কর্মঠই রয়েছে সে। কাঠগোলা, করাতকল তেমনিই চলছে। আরো কয়েকটা লঞ্চ কিনেছে রূপলাল। খলসেখালি থেকে আর পুঁইজালিতে গিয়ে লঞ্চ ধরতে হয় না। খলসেখালি থেকেই লঞ্চ ছাড়ে শহরে যাবার জন্য। এখানকার গঞ্জেও এখন ব্যাটারিতে মাইক বাজে। হাট বসছে এখন এখানেই। সভ্যতার থাবাটা আস্তে আস্তে বনের দিকেও প্রসারিত হয়েছে।

সেদিন হঠাৎ বনের দিক থেকে একটা নৌকা এসে খলসেখালির ঘাটে ভেড়ে। এমন অনেক নৌকাই ভেড়ে ফরেস্টের জেটিতে, হাট-তলার ঘাটে। এই নৌকা ভেড়ার পর বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। নতুন ফরেস্ট অফিসারও কি করবে ভেবে উঠতে পারে না।

নৌকার আরোহী প্রবল জ্বরে প্রায় সংজ্ঞাহীন।

মাঝিরা বলে, কে জানে মায়ের দয়া-টয়া হবে বোধহয়, এমন রোগীকে নে নৌকায় যাবোনি। মরেফরে গেলে তখন পুলিশে হুজ্জুতি করবে বাবু।

নৌকার আরোহী মাঝবয়সী এক তরুণ। সঙ্গে রয়েছে তার একটি চাকর।

সেও ঘাবড়ে গেছে বিপদে পড়ে। চাকরটি বলে বনবাবুকে, —যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন বাবু। এই অবস্থায় ওঁকে কোথায় নিয়ে যাই। নৌকাতে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে আরো অসুখ তো বাড়তেই থাকবে।

মাঝিদের সঙ্গে চাকরটির রোগী নামানো নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে, সেই সময় কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ে।

কৈলাস একেবারে আদি অকৃত্রিম হ্যামার ব্র্যাণ্ড চিকিৎসক। সব্য-সাচীও বলা চলে। একধারে এলোপ্যাথ, অন্যদিকে হোমিওপ্যাথ। পয়সা বেশি পেলে ইনজেকশনও দেয়। এমন একটা রোগী পেয়ে সেও খুশি।

নৌকায় গিয়ে রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করে বলে, বসন্ত-টসন্ত নয়, স্রেফ ম্যালেরিয়া। শীতে কাঁপছে দেখছিস না।

মাঝি বলে, যা হয় হোক। ওই রুগী নে যাবো না। ফ্যাসাদে পড়বো শেষমেশ!

কৈলাসও ভাবছে কথাটা। এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে সেরে উঠবে। নৌকায় গেলে অসুখ বাড়বে বই কমবে না। বিপদও হতে পারে।

হঠাৎ কথাটা বনবাবুর মাথায় এসে পড়ে। বলে সে, চলো ডাক্তার দেখি লোকটার কি ব্যবস্থা করা যায়। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক সুন্দরবনে বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছেন। বড় ঘরের ছেলে। যদি কিছু করতে পারি।

রূপলালের গেস্ট-হাউস প্রায় খালিই পড়ে থাকে। মোটামুটি সব ব্যবস্থাই আছে। বনবাবু, কৈলাস ডাক্তার আর মাছের আড়তের মদনও এসেছে রূপলালের কাছে।

মদন সেই হারানো কামিনীর ভাই। এখন মাছের আড়তে সরকারীর কাজ করে। বোনটা সেই যে হারিয়ে গেছে আর ফেরেনি। বেশ কিছুদিন আগে মদন খবর পেয়েছিল কামিনী নাকি দীঘার ওদিকে কোথায় আছে। দু-জনের খোঁজে সেখানেও গেছল মদন, যদি বোনের সন্ধান পায়।

কিন্তু সেখানেও পায়নি তাদের। কে বলে, ছিল বটে। ও গেল মরশুমেই তো চলে গেছে বালেশ্বরের দিকে। সঠিক খোঁজও দিতে পারে না কেউ।

মদন ফিরে এসেছিল। অবশ্য কথাটা কাউকে জানায়নি। রূপলালকেও বলেনি কিছু। বোনটা কোথায় যে চলে গেল কে জানে। বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে খচখচ যে করে না তা নয়, তবু সব ভুলে বাঁচার রসদ সংগ্রহের জন্য লড়াই করতে হয়।

আজ হঠাৎ ঘাটে অজানা অসুস্থ ভদ্রলোকের জন্য ওরা এসেছে

রূপলাল মান্নার কাছে।

রূপলাল মান্নাকে কিভাবে তোয়াজ করতে হয়, তা জানে কৈলাস ডাক্তার।

রূপলাল বাড়িতেই ছিল। এদের দেখে এগিয়ে আসে, —কি ব্যাপার ডাক্তার? বনবাবুও রয়েছেন!

বনবাবু বলে, একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

বিপদের বিবরণ জানাতে রূপলাল বলে, —রুগীকে এনে তুলবো, শেষে যদি কিছু গড়বড় হয়ে যায়?

কৈলাস ডাক্তার বলে,

এখানে আপনিই অগতির গতি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া। কয়েকদিনেই সেরে উঠবে। এখন একটু আশ্রয় না পেলে নৌকায় নদীর হিমে খতমই হয়ে যাবে হয়তো। আপনার কাছে তাই ছুটে এলাম। ওর নৌকার মাঝিরাও ওকে আর নিয়ে যাবে না বলেছে। এই খলসে-খালিতেই ফেলে পালাবে; আপনার এলাকায় বেঘোরে মরবে একটা লোক?

রূপলাল কি ভেবে বলে,

ঠিক আছে। গেস্ট-হাউসে আনো তাকে। কি যে করো তোমরা। যেখানে যত ঝুটঝামেলা হয় সব আমার ঘাড়ে!

কৈলাস ডাক্তার বলে, বড়গাছেই তো ঝড় বেশি বাজে মান্নামশাই। এখানের মাথা তো আপনিই। আর কোথায় যাবো বলুন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ধরাধরি করে অসুস্থ ভদ্রলোককে তুলে আনে রূপলালের গেস্ট-হাউসে। তার চাকরটাও মালপত্র নিয়ে এসেছে। বলে রূপলাল, —শেষে ঝামেলায় পড়বো না তো?

কৈলাস ডাক্তার বলে—আপনার ঝামেলা? কি বলেন মান্নাবাবু? আপনার ভরসাতেই তো রয়েছি আমরা আবাদে।

কৈলাস ডাক্তারই এবার রীতিমতো পরীক্ষা করে চাকরটাকে বলে, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়াল করে খাইও হে, আর এখানেই থাকো,

বটবৃক্ষের আশ্রয়ে। যখন যা দরকার হবে, বলবে এদের। এসে যাবে। সেবাযত্ন করে তোমার বাবুটিকে খাড়া করে তোলো বাপধন। তাহলেই কেতাত্থ হবো।

এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে তা অসীমের জানা নেই। সে টেরও পায় না যে তাকে নৌকা থেকে তুলে আনা হয়েছে এখানে। অসীম ঘোষ কলকাতার এক নামী সংবাদপত্রের রিপোর্টার।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তার নেশা দেশভ্রমণ করা। দূর দুর্গমের হাতছানিতে প্রায়ই সে পথে বের হয়ে পড়ে। এমনি করে সে হিমালয়ের পাহাড়-উপত্যকায় হারিয়ে যায়, শতোপন্থ, রূপকুণ্ড, পঞ্চকেদার, অমরনাথ—এসব জায়গাতেও গেছে।

রোটাং গিরিপথ পার হয়েও হিমালয়ের উত্তর সীমান্তে বহু অঞ্চলে ঘুরেছে। তার লেখা বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার রিপোর্ট সংবাদপত্রের প্রচার বাড়ায়। এবার অসীম নিজেই তোড়জোড় করে দুর্গম সুন্দরবন আর লাগোয়া আবাদ অঞ্চলে এসেছিল। নিজেও ভালো ছবি তোলে। ছবি আর লেখা দুটোতেই তার সমান দখল।

সুন্দরবনের এই অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে অসীম।

তার সহচর বাহাদুরকে অসীম এনেছিল সেবার নেপালের মুক্তিনাথ দর্শন করতে গিয়ে। বাহাদুর তখন থেকেই রয়ে গেছে অসীমের সঙ্গে। অসীম ঘর বাঁধেনি—বাঁধার আগ্রহও তার নেই। সেই ঘরছাড়া অসীমের ঘর সামলায় বাহাদুর।

অসীম নৌকায় বেহুঁশ হয়ে যেতে বাহাদুরও বিপদে পড়েছিল। কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। শেষ অবধি এখানে আশ্রয় পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মনিবকে ওই-ই মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করে। এর মধ্যে কৈলাস এসে ওষুধপত্র বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর আবাদে স্তব্ধতা নামে। কাঠকলের মেশিনের শব্দ থেমে যায়,

মাছের আড়তের হাঁকডাক, নৌকার মাঝিদের কলরবও থেমে আসে।

হাটতলার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়। ক্রমশ নদীর ওপারের আদিম অরণ্যের স্তব্ধতা গ্রাস করে এই খলসেখালির ছোট্ট গঞ্জকে। ইদানীং আরো সমস্যা বেড়েছে।

বনে বোধহয় খাবারের অভাব হয়েছে, না হয় বাদাবনের বাঘদের সাহস বেড়েছে। মাঝে মাঝে তারা এখন ছোট গাঙ পার হয়ে আবাদে এসে হানা দেয়।

এখানে এলে গৃহস্থের ছাগল, গরু বাছুর, না হোক, অসাবধানী মানুষও মিলে যায়। বাঘের ভয়ে তাই এখন রাতবিরেতে মানুষজন সহজে বের হয় না। গঞ্জে আদিম রাত্রি নামে।

রূপলাল অনায়াসেই ঘুমোয়। তার ঘুমেতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না বাঘের গর্জন। এর আগে সে দু-একটা বাঘও মেরেছে। অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। আর চামড়াগুলোও প্রচুর দামে বিক্রি করেছে, সোজা বিদেশে চলে গেছে সেগুলো গাঙ পার হয়ে।

ঘুম আসে না বিজলির। ক'টা বছর এই সুন্দরবনে রয়েছে সে।

যে মন নিয়ে প্রথম এখানে ঘর বেঁধেছিল, সেই মন আজ আর নেই। সবকিছু তার হারিয়ে গেছে। নিষ্ঠুর একটা দৈত্যকে ভালোবেসে ছিল সে ভুল করে। আজ তিলে তিলে সর্বস্ব দিয়ে বিজলি সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে।

কোথায় একটা চাপা গর্জন ওঠে। কোনো বাঘ বোধহয় গাঙ পার হয়ে মানুষের বসতে এসে শিকারের সন্ধানে ঘুরছে, গজরাচ্ছে।

হয়তো এখুনি কোনো প্রাণীর উপর লাফ দিয়ে পড়ে ধারালো থাবা আর দাঁতে ফালা ফালা করে দেবে তাকে।

বিজলি চমকে ওঠে। কাঠ হয়ে বসে থাকে বিছানায়।

ডাকটা কাছেই শোনা যায়। ও কী বিজলির সন্ধানেই ঘুরছে। গাঙের জলের বিস্তারে গর্জনটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে যেন এগিয়ে আসছে এইদিকে। লাফিয়ে পড়বে তার ওপর।

বিজলি খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়। আর্তনাদ করে ওঠে, না-না-না। ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে যায়।

ওদিকে রূপলাল ঘুমোচ্ছে, তার কানে যায় না অসহায় বিজলির আর্তনাদ, চেয়েও দেখে না তার ভীতত্রস্ত মূর্তি। তার এসব দেখার মতো চোখ, শোনার মতো কান নেই।

কাল থেকে অসীম ঘুমুচ্ছে। তার ঘুম ভাঙ্গে সকালে পাখির ডাকে। জানালা দিয়ে এসেছে দিনের আলো। জায়গাটা সবুজ গাছে ঢাকা। নানা ফুলের মিষ্টি সুবাস ওঠে।

অসীম আজ একটু সুস্থ বোধ করে। ক্রমশ চোখ খোলে।

নৌকার দুলুনি নেই। নেই গাঙচিলের ডাক। নদীর স্রোতের শব্দ, বাতাসের ঝড়ো সুর। কেমন শান্ত ঘরোয়া পাখি ডাকা পরিবেশ।

অসীম অবাক হয়। নৌকার ছই-এর নিচে নয়, পাকাবাড়িতেই রয়েছে সে ভালো বিছানায়।

—এ কোথায় এলাম বাহাদুর?

বাহাদুর মনিবের জ্ঞান ফিরতে দেখে বলে, —এক বাবুর কোঠিতে রয়েছেন সার। উ মাঝি লোগ হিঁয়াই ছোড় দিয়া আপ্‌কো। ইখানের কুছ, আদমী ঔর এক ডাংদার বাবুই ইখানে আনলো, দাওয়াই ভি দিল।

অসীম অবাক হয়। এত সব ঘটনা ঘটে গেছে অথচ সে কিছুই জানে না।

শুধোয় সে, —কার বাড়িতে এনেছে রে? জায়গাটার নাম কি?

বাহাদুর এত সব জানে না। কি উত্তর দেবে ভাবছে, এমন সময় রূপলাল মান্নাকে স্বয়ং আসতে দেখে বলে,

মালিক খুদ আ গিয়া সাব।

রূপলালও দেখে অসীমকে। কিছুটা সুস্থ বোধ হয় দেখে। অসীম বিছানায় উঠে বসতে যাবে,

রূপলাল বলে, থাক-থাক। উঠতে হবে না। কাল ওরা যখন আনলো, আপনাকে দেখে আমিও ঘাবড়ে গেছলাম। যাক, এখন জ্বরটা আছে?

অসীম বলে, না—নেই। ভোরে প্রচুর ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়েছে। তবে খুবই দুর্বল।

রূপলাল বলে,

ক'দিন বিশ্রাম নিন। কৈলাস ডাক্তারের লাল পানি খান। আবাদের বুনো হাওয়ায় সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এর মধ্যে কৈলাস ডাক্তারও এসে পড়েছে। রূপলাল বলে ওঠে,

আপনার ডাক্তারও হাজির।

কৈলাসও রোগীকে কিছুটা সুস্থ দেখে খুশি হয়।

বলে সে, না—জ্বর এখন নাই। তবে ম্যালেরিয়া তো, আবার আসতে পারে। ভাববেন না। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর বিছানা ছেড়ে উঠবেন না। ওহে বাহাদুর, বাবুর দিকে নজর দিও। শরীর খুবই দুর্বল। সামলাতে সময় নেবে।

রূপলাল বলে, আমি চলি—আজ অনেক কাজ। পরে কথা হবে।

অসীম ঘাড় নাড়ে।

লোকটাকে দেখেই বোঝা যায় খুব শক্তপোক্ত মানুষ, না হলে বাদাবনের এই মুলুকে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসা অসম্ভব।

কৈলাস ডাক্তারেরও চেম্বার খুলতে হবে। বলে সে,

ওষুধ ওই চলুক, কাল দেখে বদলাবো। এখন উঠি।

অসীমের করার কিছু নাই। এসেছিল সুন্দরবনকে দেখতে। কয়েক-দিন মাত্র বনে ঘুরেছে, দেখেছে বনের অসংখ্য ছোট-বড় খাড়ি-খাল। দুদিকে নেমে এসেছে ছায়াসবুজ গরান, কেওড়া, পশুর গাছের ঘন জঙ্গল। ভাঁটার সময় খালের দুদিকে জেগে ওঠে পলিকাদা—জল তখন খালের নিচে, নৌকা কোনমতে চলে। আর দুপাশের ঘন বন থেকে যে কোনো মুহূর্তেই লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে কোনো তাগড়াই বাঘ। মরা ভাটির গাঙে বিরাট মাথা তুলে কুমীর জেগে ওঠে।

এই বিচিত্র জগতে তবু মানুষ আসে অন্নের সন্ধানে।

বনের গাছ, নদীর মাছ এখানে প্রচুর। ফুলে ফুলে মধুর সঞ্চয়, আসে মধুমৌলির দল, মধুর নেশায়।

অসীম সেই জীবনকে দেখতে এসেছিল। কিছু কাজ করার ইচ্ছা ছিল ওদের ওপর। কিন্তু বিপদ বাধিয়েছে অসুখে পড়ে। এখন এঁদের দয়ায় আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে।

ছায়াঢাকা বারান্দায় একা বসে আছে অসীম। সঙ্গে দু-একটা ম্যাগাজিন ছিল, সেগুলোর পাতা ওলটাচ্ছে। হঠাৎ ওই বাড়ির দিক থেকে এক ভদ্রমহিলাকে আসতে দেখে চাইল অসীম। ভদ্রমহিলার সাজগোজ একটু বেশিমাত্রায় উগ্র। দামী একটা শাড়ি পরেছে। যেন তার কত আছে সেটা দেখাতে চায়। এককালে যে মহিলা সুন্দরী ছিল তা বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, শহর সংস্কৃতিরও যেন একটা বিলীয়মান স্পর্শ রয়েছে ওর হাঁটাচলায়। তবু কেমন একটু বেসুরো মনে হয় অসীমের।

নমস্কার।

ভদ্রমহিলা দুহাত তুলে নমস্কার করাতে অসীমও নমস্কার করে চেয়ে দেখছে মহিলাকে। মহিলা নিজেই পরিচয় দেয়, আমি মিসেস মান্না। রূপলালবাবুর স্ত্রী।

এই বাদাবনের আবাদে কোনো মহিলা তার স্বামীর নাম ধরে বলে না। অসীম একটু বিস্মিত হয় ওকে দেখে। সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না ভদ্রমহিলা, একটা পা কেমন টেনে টেনে চলছে। দেহ তো সুস্থ নয়ই, মানসিক দিক থেকেও যে অসুস্থ তা দেখেই মনে হয় অসীমের। বলে সে, বসুন!

ভদ্রমহিলা চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে নিয়ে বলে, ও বোধহয় হাটতলায় চলে গেছে!

অসীম বলে, তাই তো বলে গেলেন রূপলালবাবু।

ভদ্রমহিলা ওর জবাবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, আজ ফিরতে দেরি হবে। বসা যেতে পারে।

নিজেই বাঁ পা'টাকে টেনে টেনে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। ভদ্র-মহিলা এবার নিজের নামটা বলে, আমার নাম বিজলি বোস। এখন মান্না হয়েছি।

অসীম বলে, আপনাদের এই জায়গাটা বেশ সুন্দর।

বিজলি বলে ওঠে বিরক্তিভরা কণ্ঠে, ছাই। দুদিনই ভালো লাগে। যদি এখানে আটকে থাকতে হয়, দেখবেন মনে হবে ওই নদীতে ডুবে নিজেকে শেষ করে দিই। এই মাটি, এই জগৎ, এখানের মানুষ শুধু নিতেই জানে, জোর করে কেড়ে নিতে জানে। কানাকড়িও দিতে জানে না।

অসীম ওর জ্বালাভরা কথাগুলো শুনে বলে, না, না। এই দেখুন না, অজানা অচেনা মানুষ—নৌকাওলারা ফেলে চলে গেল, এঁরা তো তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছেন, বাঁচিয়েছেন—

বিজলি মাথা নাড়ে। মাথা নাড়া ওর বোধহয় মুদ্রাদোষ। বলে, কে জানে, এও হয়তো করেছে নিজের কোনো স্বার্থে। আপনি তো লেখক, খবরের কাগজের লোক, তাই না?

অসীম অবাক হয়। শুধোয় সে, আপনি জানলেন কি করে?

বিজলি ক'দিন সামনে আসেনি অসীমের, সুযোগ পায়নি। বাহাদুরের কাছে সব শুনেছে। বিজলি বলে, বাহাদুর আমাকে সব বলেছে। শুনে অবধি মনে হয়েছে সময় পেলে পরিচয়টা করে নেব। দুটো কথা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো। এখানে কথা বলার লোকও নেই।

ওদিকে কাকে ঢুকতে দেখে হঠাৎ উঠে পড়ে বিজলি। বলে, আমি আসি, পরে দেখা হবে। পা টেনে ঘাড় কাৎ করে যেতে যেতে হঠাৎ পিছন ফিরে বলে, আমি এখানে এসেছিলাম কাউকে বলবেন না, ওকেও না।

অসীম ওর এই ব্যবহারে বিস্মিতই হয়। ওই ভদ্রমহিলা জানাতে চায় না তার স্বামীকে এখানে আসার কথা। আর দেখে মনে হলো রূপলালকে ভয়ও করে সে। যাকগে। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। এ নিয়ে বেশি ভাবতেও চায় না অসীম। আর কয়েকটা দিন এখানে থেকে সুস্থ হয়েই সে চলে যাবে। তবে সুন্দরবন দেখেই যাবে। এত দূর এসে কাজ শেষ না করে ফিরবে না। অতএব চুপচাপ থাকাই ভালো।

হাটের কলরব, কোলাহল বাড়ছে। গাঙের বুকে নৌকার ভিড়

জমে। বারান্দা থেকে অসীম বাইরের এই বিচিত্র গঞ্জের ব্যাপার-স্যাপার দেখছে। এই কলরব চাঞ্চল্য একদিনের জন্য, তারপরই আবার নামবে অসীম নির্জনতা। নদীতে এখানে দিনে দুবার জোয়ার আসে। কলস্বরে সমুদ্র এসে হানা দেয় জনপদে। গঞ্জের স্তিমিত জীবনেও তেমনি জোয়ার আসে হাটবারে। বাকি দিনগুলোয় শুধু ভাটার টান।

কামিনীর জীবনেও সেদিন জোয়ার এসেছিল। স্বৈরিণী মেয়েটা কি খেয়ালবশে গোখরো সাপের ল্যাজে পা দিয়েছিল। তারপর উদ্যতফণা হিংস্র বিষধর সাপটাকে ঠেলে উঠতে দেখে ভয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু রমণীর মন তো! পালাতে পালাতেও আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। তাই রতনকে নিয়ে উধাও হয়েছিল দীঘার ওদিকে। কামিনীর ভালো লেগেছিল সেই অঞ্চল। সবুজ ধানক্ষেত, গাছগাছালি ঘেরা গ্রামবসত। তাদের বাদা অঞ্চলের মতো ভয়ঙ্কর নয়। সমুদ্রের ধারে সবুজ ঝাউবনে হাওয়া কাঁপে। রতন সেখানে মাছধরা ট্রলারে সারেঙে কাজ পেয়েছিল।

কিন্তু সেখানে কাজ মাত্র কয়েক মাসের জন্য। পূজার পর থেকে শীতের হাওয়া পড়ে, তখন সমুদ্রও কিছুটা নিরাপদ। শীতভোর ওরা ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে যায়, ফেরে তিন চার দিন পর। কামিনী পথ চেয়ে থাকে। ট্রলার ফিরলে যেন নিশ্চিন্ত হয়। শীতের পর দক্ষিণা বাতাসে ভর করে আসে গ্রীষ্মকাল। শুরু হয় ঝড়-তুফান, কালবৈশাখীর দিন। তখন ট্রলারগুলো দীঘায় থাকে না। অনেকেই ভিতরে সুবর্ণরেখার বুকে চলে যায় বালেশ্বর জেলার মধ্যে। কামিনীও রতনের সঙ্গে চলে যায় তাদের নতুন ঠিকানায়।

কামিনী এখন অনেক বদলে গেছে। রতন ভালো রোজগার করছে। সে বলে, এখানের চেয়ে মাছ বাদাবনেই বেশি। নিজের ট্রলার করতে পারলে বাদাবনেই যাবো কামিনী।

কামিনীর মন থেকে রূপলালের ভয়টা অনেক কমে এসেছে। আজ সে জানে তার রতন আছে। তার জোরেই কামিনীর জোর। তাই তারও মনে হয় ফিরে যাবে তার মাটিতে। সেখানের মানুষদের দেখাবে কামিনী জোয়ারের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়নি। সে পায়ের

তলে মাটি পেয়েছে। একজনকে ভালোবেসে ঘর বেঁধেছে। শুধোয় কামিনী, আমাদের নিজেদের ট্রলার হবে ?

রতন ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, হ্যাঁরে চিরকালই কি পরের লঞ্চে ভাড়া খাটবো ? কিছু টাকা জমিয়েছি, আর কিছু টাকা সরকারী ঋণ পেলেই ট্রলার কিনবো। নিজেই ব্যবসা করবো মাছের। সুন্দরবনের মাছের দরও বেশি আর মেলেও বারো মাস। ওদিকেই যাবো দু-তিন জন মিলে।

তাহলে তো ভালোই হয় গো।

রতন বলে, কলকাতাতেও খবর করছি। ওখানে দু-তিনজন মিলে সমবায় করে মাছের ব্যবসায় নামবো, ট্রলার হলেই।

কামিনী বাদাবনে ফেরার দিন গুনছে তখন থেকে।

অসীমের সঙ্গে কথা বলে বিজলি যেন কিছুটা স্বস্তি পায়, তার নাগাল থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই কলকাতার মানুষ ওই অসীম। ওর মাঝে বিজলি যেন তার হারানো সত্তাকে, হারানো অতীতকে ফিরে পেয়েছে। তাই ওর কাছে আসতে মন চায়। ওর কাছে নিজের দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করে কিছুটা হালকা হতে চায় সে। স্বপ্ন দেখে বিজলি সে যেন এই বাদাবন থেকে আবার সেই জগতে ফিরে গেছে।

অসীম কিছুটা সুস্থ, তবে দুর্বলতা এখনো কাটেনি। কৈলাস ডাক্তার বলে, আর পাঁচ-সাতদিন থেকে একেবারে ফিট হয়ে যান মশাই। রূপলাল মান্নাও বলে, জলে তো আর পড়ে নেই। থাকুন ক'দিন। তবু সন্ধ্যাটা গল্প করে কাটে। পড়ে আছি অন্ধকারে।

অসীম রয়ে গেছে। অবশ্য দিনভোর রূপলালের দেখা মেলে না। নানা কাজে ব্যস্ত থাকে সে। অসীম পড়াশোনা নিয়েই থাকে।

সেদিন বিজলিকে আসতে দেখে চাইল অসীম। বিজলি জানে রূপলাল পুঁইজালির কারখানায় গেছে, দিনভোর সেখানেই থাকবে। তাই বিজলি এসেছে কিছু প্যাকেট নিয়ে।

এসব কি ? অসীম শুধোয়।

বিজলি তার সেই পুরনো খামগুলো থেকে মলিন বিবর্ণ কিছু খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকার কাটিং, মলিন ছবি বের করে দেয়। বলে, আমার আগেকার পরিচয় কিছুটা ওতেই পাবেন।

অসীম দেখছে কাগজের কাটিংগুলো। কোনো মঞ্চে নাটক করার রিপোর্ট, সেখানে বিজলি বোসের অভিনয় ক্ষমতা, তার বাচনভঙ্গি—সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো নাটকে অভিনয়ের সংবাদে ছবি ছাপা হয়েছে।

বিজলি বলে, দেখলেন তো এককালে অভিনয় জগতে আমার নামডাক ছিল। আর দেখতেও খারাপ ছিলাম না। আজ যা দেখছেন সেটা এখানে এসেই হয়েছে, বয়স আমার চল্লিশের এদিকে—কিন্তু বুড়ি হয়ে গেছি মনে হয়।

অসীম জানে মেয়েরা চির-যৌবনবতীই থাকতে চায়। তাই সে বলে, না-না, কি এমন ভেঙেছে আপনার চেহারা? ভালোই তো আছেন।

বিজলি বলে, অনিমেষও তাই বলত। ও বলত সত্যিই তুমি সুন্দর! বেচারা অনিমেষ!

অসীম শুধোয়, অনিমেষ। সে কে?

বিজলি বলে, ওমা, অনিমেষের খবর এখানের সবাই জানে, তুমি জানো না? অনিমেষ—ওই পুঁইজালের করাতকলের ম্যানেজার, খুব ভালো ছেলে।

অসীম শুধোয়, তাকে তো দেখিনি।

হঠাৎ চমকে ওঠে বিজলি। তার হাত কাঁপছে। ছোঁ মেরে সেই রিপোর্ট-কাটিংগুলো তুলে নিয়ে এবার হনহন করে পালালো। যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতোই পালালো। ওই অনিমেষের প্রসঙ্গ যেন সে আর তুলতেই চায় না।

অসীম দেখছে বিচিত্র মহিলাটিকে। ওর মনের কোথাও রয়েছে একটা নিদারুণ বঞ্চনা, ভয়, যা ওকে মাঝে মাঝে এমনি অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। হয়তো কোনো বেদনাময় ইতিহাস রয়েছে এর পিছনে

যেটাকে বিজলি ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু পারে না। অসংযত মুহূর্তে সেই দুঃসহ যন্ত্রণাটা ফুটে বের হয়।

বিজলি কোনোমতে সরে এসেছে ওখান থেকে। অনিমেষের কথাটা সে কারো কাছেই জানাতে চায়নি। সেটা তার কাছে একটা চরম বেদনা, অপমান, সর্বনাশের ঘটনা, যা তার জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে—

সেই দিনগুলোর কথা আজও ভোলেনি বিজলি। সেদিন তার দেহে মনে কি আলোড়ন এনেছিল অনিমেষ। সেই সুন্দর মার্জিত রুচির তরুণকে আজও ভোলেনি বিজলি।

রূপলালের সঙ্গে তার তুলনাই চলেনা।

অনিমেষকে আজও ভোলেনি বিজলি। সেইই তার মনে আবার নিরানন্দ বন্দীজীবনে সুর, ভালোবাসার স্বপ্ন এনেছিল।

আবার সেই সভ্যজগতে ফিরে গিয়ে নতুন করে বাঁচতে পারবে সে।

বিজলির মনে পড়ে যাত্রা মঞ্চের সেই মুহূর্তগুলো। সাজঘরে জোরালো আলোয় বসে মেক-আপ করে নিজেকে কোনদিন রাজকন্যা, কোন দিন প্রেমিকা সাজা ছিল তার পেশা।

জনতার হাততালি—অভিনন্দন ভরা জীবন থেকে তাকে কৌশলে ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল রূপলাল।

সেও বিজলির কোন স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করতে পারেনি।

তাই এই জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

এমনি দিনে বিজলি দেখেছিল অনিমেষকে। আবার তার জীবনে এক স্বপ্নের সাড়া জেগেছিল ওই অনিমেষকে কেন্দ্র করে।

গোপনে সে সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যই মরীয়া হয়ে সেইরাতে রূপলালের ঘর ছেড়ে পথে পা দিয়েছিল।

অনিমেষও তাকে ফেরাতে পারেনি।

দুজনে তাই চলে যাচ্ছিল এই দানবের জগৎ ছেড়ে তাদের স্বপ্নের জগতে।

কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হতে দেয়নি রূপলাল।

অনিমেষ আর তাকে ধরে ফেলেছিল রূপলাল। অনিমেষকে তার জন্য প্রাণও দিতে হয়েছিল সেই রাতে।

আর এই স্বার্থপর রূপলাল সেদিনও তাকে মুক্তি দেয়নি। আবার এনে বন্দী করে রেখেছে এই কারাগারে।

বিজলি এই বন্দী জীবনকে আবার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে অনেক মূল্য দিয়ে।

ওই আঘাতটা বিজলির দেহটাকেই শুধু বিকৃত করে দেয়নি, বিজলির মনকেও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

এখন সে জেনেছে তার মুক্তির কোন আশাই নেই।

জীবনের বাকী দিনগুলোও ওই শয়তানের আজ্ঞাবহ বাঁদী সেজে মিথ্যা একটা অর্থহীন পরিচয় বহন করেই বাঁচতে হবে।

লোকে বলে ওকে—রূপলাল বাবুর স্ত্রী!

গঞ্জের মানুষও তাকে সমীহ করে। অনেক মেয়েরাও এখানে তার কাছে তাদের দুঃখ জানাতে আসে। কার স্বামী বাদাবনে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে—নাহয় গাঙে ডুবেছে। তাদের সংসার অচল, অনশনে দিন কাটছে, তাদের অনেকে আসে বিজলির কাছে।

তাদের দুঃখের কথা জানায় বিজলিকে—তাকেও শুনতে হয় এসব কথা। কিছু সাহায্যও করে।

কিন্তু বিজলির জীবনের বঞ্চনা, ব্যর্থতার কথা ওরা অনেকেই জানে না! ওরা ভাবে কত সুখেই না রয়েছে বৌরানী।

এই বঞ্চনাটাই বিজলির জীবনের সব চিন্তাধারাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

এই ভাবেই দিন কাটছিল বিজলির।

অনিমেষকে ভুলেই গেছল প্রায়। এই নিঃসঙ্গ বন্দী জীবন বিজলির মনে একটা বিকৃতি আনে।

মনে হয় এখনো সে সেই অভিনেত্রী বিজলিই রয়ে গেছে। তার জীবনের উপর দিয়ে কোন ঝড়ই বয়ে যায়নি।

নিজেকে আয়নায় দেখে।

সেই শ্রী, যৌবন সব কেমন হারিয়ে যাচ্ছে। ভাঁটার টানে—সেই শূন্য গাঙের বুকে জাগে পলি কাদার গ্লানি। তার যৌবনেও ভাঁটার টান আসছে।

তাই নিজেকে সে বেশি সাজিয়ে তেমনি আকর্ষণীয় করে রাখতে চায়।

বিকালে বের হয় গাঙের দিকে।

এসে বনবিভাগের বাংলোর ওদিকে ছায়াঘেরা নদীতীরে বেঞ্চে বসে শূন্য দৃষ্টিতে অকূল গাঙের দিকে চেয়ে থাকে।

সেদিন বিজলি ওই ঘাটে নৌকাটাকে ঘিরে লোকজনের ভিড় দেখছিল। দেখছিল কৈলাস ডাক্তার অন্যরা কাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গেল তাদের বাড়ির লাগোয়া ওপাশের গেস্ট হাউসে।

ওখানে অবশ্য অনেকেই আসে মান্যগন্য ব্যক্তি, সরকারি অফিসার, নেতারা। গেস্ট হাউসে পান ভোজন হয় রাতের বেলায়। হৈ চৈও হয়।

আবার মানী অতিথিরা চলে যায়।

বিজলি দেখে মাত্র।

এবার সেই সব ঘটনাগুলো ঘটে না।

মদ, খানা-পিনা হৈ চৈ তেমন হয় না। রূপলাল মাঝে মাঝে যায়। আর আসে কৈলাস ডাক্তার।

বাড়ির কাজের মেয়ে কুসুম বলে,

—কোন একবাবুর বেহুঁস জ্বর। নৌকাতেই অঘোরে জ্বরে পড়েছিল। তাকেই তুলে এনেছে ওই অতিথিশালায়। তাই কৈলাস ডাক্তারও ঘন ঘন আসছে ওখানে।

বিজলি চমকে ওঠে।

চকিতের জন্য মনে পড়ে সেই রাতের নিষ্ঠুর হত্যার রহস্যটা। আর্তনাদ করে অনিমেষের রক্তাক্ত দেহটা গাঙে ছিটকে পড়ে আর উদ্যত বন্দুক হাতে হাসছে রূপলাল নিষ্ঠুর দানবের মত।

আবার তেমনি কোন ঘটনাই ঘটিয়েছে কিনা কে জানে। বিজলি শুধোয়,

—বাবুর নাম কি রে?

মেয়েটা কাজ করতে করতে বলে—তা জানিনা বাপু' তবে কৈলাস ডাক্তার বলেছে 'মালোরী' জ্বর বাবুর। কড়া অসুখ।

বিজলি তার ঘর থেকে দেখছে ওই অসুস্থ ভদ্রলোককে।

কয়েকদিন থেকে একটু সুস্থ হয়েছে।

বিজলিও জেনেছে ওই ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এদিকে বেড়াতে এসে নৌকাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তার সঙ্গের ওই চাকরটিই বুদ্ধি করে এখানে তাকে নিয়ে এসেছিল।

কাজের মেয়ে কুসুম গঞ্জের গেজেট।

মেয়েটা এবাড়িতে ছেলেবেলা থেকেই আছে। বিজলির মেয়েটাকে ভালো লাগে।

সারা গঞ্জে কোথায় কি হচ্ছে। হাটতলায় কি ঘটছে—কাদের মধ্যে মারপিট হয়েছে, মান্নাবাবুর মাছের আড়তেও কি সব গোলমাল হয়েছে এসব খবর ওই-ই এনে দেয় বিজলিকে।

কুসুম এর মধ্যে ওই গেস্ট হাউসের বাবুর জন্য গরম দুধ দিতে গিয়ে বাবুর সব খবরই শুনে এসেছে তার চাকরটার কাছ থেকে। সব কথা অবশ্য বুঝতে পারেনি বাহাদুরের—বলে কুসুম,

—মাঝে মাঝে কি সব 'কেডিমেডি়' কথা বলে বুঝিনা। তবে ছেলেটা খুব ভালো। ওর বাবুও কলকাতার লোক, ঢের নেকাপড়া জানে।

বিজলির মনে হয় কলকাতার কথা।

সেই মুক্তির জগৎ। কতদিন সেখানে যেতে পারেনি। অনিমেষ তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

এবার সে যেন সত্যই ফিরে গেছে সেখানে—আবার যেন নতুন করে মুক্তির স্বপ্ন দেখে ওই বিজলি।

তাই অসীমের খবর নিতেই গেছল সেদিন গেস্ট হাউসে।

ক্রমশ বিজলিও কথা বলার লোক পায়। বাড়িতে সারাদিন

একাই থাকে। কাজের মেয়ে কুসুমের সঙ্গে আর কত কথা বলা যায়, তাই মাঝে মাঝে বিকালে গেস্ট হাউসে চলে আসে বিজলি।

অসীমেরও সময় কাটে নানা কথায়।

ক্রমশ অসীমও দেখছে ওই মহিলাকে।

এককালে সুন্দরী ছিল। বিজলি যে বাদাবনের মেয়ে নয়, সেও কলকাতায় এককালে বাস করেছে, মঞ্চেও অভিনয় করেছে এসব কথা ও বলে।

তবু অসীমের মনে হয় কোথায় যেন একটা আতঙ্ক রয়েছে বিজলির সারা মন জুড়ে। কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনার বোঝা সে বয়ে চলেছে।

অসীম এখানে হঠাৎ এসে পড়েছিল।

আর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কয়েকদিনের জন্য আটকে পড়েছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হলেই সে ফিরে যাবে কলকাতায়।

কিন্তু এই আবাদ অঞ্চলে রূপলালবাবুর আশ্রয়ে এসে অসীমের সন্ধানী মন যেন কোন এক রহস্যের সন্ধান পায় এই বিজলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

সেদিন বিকালে বিজলি এসেছে।

অসীম দেখছে ওকে। এখন তার যৌবনের গাঙে এসেছে ভাঁটার টান—তবু সেই হারানো যৌবনকে ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে সে।

অসীম শুধু সাংবাদিকই নয়, মানুষের পাকা খবর খুঁজতে খুঁজতে মানুষের মনের অতলের খবরও সে যেন পেতে শিখেছে।

সন্ধ্যা নামছে, বাগানের গাছ গাছালিতে আবছা অন্ধকার নামে, বিজলি ওর কাছে ঘেঁসে বসেছে। দেখেছে অসীম প্রথম প্রথম একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতো এখন সেই দূরত্বটা কমে আসছে।

এগিয়ে আসছে বিজলি।

প্রথমে এত কথাও বলত না। দু-একটা মামুলি প্রশ্ন করে চলে যেত। ক্রমশ সেই ব্যবধানটা কমিয়ে আনছে বিজলি।

এই সময় রূপলাল তার করাতকলে না হয়, মাছের আড়তেই থাকে। মাছের নৌকা, ট্রলার সব আসতে থাকে।

এক-একজনের নামে মাছের হিসাবের খাতাও রয়েছে। তাতে আনা মাছ সব ওজন করে দাম লেখা হয়।

তার থেকে দাদনের কিছু টাকা কেটে বাকি টাকা হিসাব মত পার্টিকে দিতে হয়। মাছ আনার সময়, ওজন করার জন্য আছে অন্য লোক তারা সবকাজটাই করে। সনাতন ওদের উপর।

তবুও রূপলাল নিজেও হাজির থাকছে এখন। কারণ ইদানীং ওই ট্রলার মালিকরা—লোকেরাও নানা গোলমাল শুরু করেছে।

কেউ কেউ গোপনে অন্য কোন গঞ্জে মহাজনের গদিতে মাছ বিক্রী করে দিয়ে এসে বলে—মাছ তেমন পাইনি। ফলে দাদনের টাকা তো মার যায়ই, আর মাছও মেলেনা।

লোকসান দিতে হয় রূপলালকে।

তাই রূপলাল সন্ধ্যার পর অবধি এখানে থেকে মাছ কেনা শেষ করে তবে ফেরে।

বিজলিও জানে রূপলালের সব খবর।

তাই এই সময়ই আসে অসীমের কাছে।

বিজলি ক্রমশ ওই অসীমের কাছে কলকাতার হাল খবর শুনে আবার কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে হয় অসীমের সঙ্গেই আবার চলে যাবে কলকাতায়, এখানে থাকবে না।

মনে পড়ে অনিমেষের কথা। সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। সেদিন অনিমেষও তাকে ভালোবেসেছিল। সেদিন ছিল তার রূপ যৌবন, আজও বিজলি নিজেকে তাই সাজিয়ে আনার চেষ্টা করে এখানে।

অসীমের মনে হয় ব্যর্থতার যন্ত্রণাই বিজলির মনকে অসুস্থ করে তুলেছে।

বিজলিই সেই সন্ধ্যায় অসীমকে তার জীবনের কিছু কথা প্রসঙ্গে সেই করাতকলের ম্যানেজার অনিমেষের প্রসঙ্গ আনে।

অসীম দেখেছে ওই দিকের করাতকলটাকে।

সেটা এখন রূপলালেরই। পুরোপুরি করাতকলকে সেই-ই গ্রাস করেছে। কিন্তু তার অন্তরালের কাহিনীটা জানতো না। অসীম ক্রমশ জেনেছে রূপলালের অনেক খবরই।

এখন সেও এদিক ওদিক বের হয়।

দেখছে এই খলসেখালির গঞ্জ, কেন এই এলাকার মানুষ ওকে বাঘের মত ভয় করে।

জেনেছে অসীম, ওই মাছের আড়তও দখল করেছিল রূপলাল। কোন এক গোবর্ধন সাপুই নৌকাডুবিতে রহস্যজনক ভাবেই মারা যায়।

তারপর রূপলালই মালিক হয়ে ওঠে।

এই বাদাবনে রাতের অন্ধকারে লঞ্চ, নৌকা যাতায়াত করে। বর্ডার থেকে লাখ লাখ টাকার বিদেশী মাল আনা নেওয়া করা হয়।

এই সব খবর সংগ্রহের জন্যই এদিকে এসেছিল অসীম।

ক্রমশ দেখেছে এই অন্ধকারের কারবারের মূলে রূপলালবাবুই।

বিজলিই বলে—এখানের সবকিছুর দখল নিতে চায় ওই লোকটাই।

—কেন? অসীম শুধোয়।

বিজলির চাপা আক্রোশ, ব্যর্থতার জ্বালা ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে। বলে সে—ওই ওর স্বভাব। এখানের ওই মাছের আড়তদার কামিনীকে ভালোবাসতো, রূপলাল কামিনীকে দখল করার জন্যই ওই গোবর্ধনকে ডুবিয়ে মারে—তবে কামিনী পালায় এখানে লঞ্চের সারেঙ রতন বলে একটি ছেলের সঙ্গে।

কামিনী ওকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। গোবর্ধন পারেনি। রূপলাল তার আড়ৎ দখল করে।

অসীম যেন এক রহস্য কাহিনীই শুনছে যার নায়ক ওই রূপলাল মান্না। বলে অসীম,

—বাইরে থেকে ওকে চেনার কোন উপায়ই নেই। এমনি লোক। অসীমের কথায় বিজলি যেন কিছুটা উৎসাহ পেয়ে বলে,

—হ্যাঁ। ও সাংঘাতিক লোক। এখানে রাতের বেলায় চোখ কান

খুলে রাখবেন, দেখবেন অনেক নাটকই ঘটে। বর্ডার থেকে নৌকা—লঞ্চে মাল আসে। কখনো বর্ডার ফোর্সের সঙ্গে গুলি চালাচালিও হয়। কেউ মরলে গাঙে ডুবিয়ে নিপাত্তা করে দেয়। এইভাবে লাখ লাখ টাকার মাল নানা ভাবে এখান থেকে বিদেশেও পাচার হয়।

অসীমের সাংবাদিক মন এবার কিছু সংবাদও পায়। সে শুনেছে রাতের বেলায় লঞ্চের আসা যাওয়া, দূরে কোথায় গুলির শব্দ, মানুষের চাপা স্বরের কথা।

এবার ক্রমশ চিনছে সে ওই রূপলালকে।

বিজলি বলে—খুন করা ওর কাছে খুবই সহজ ব্যাপার।

অসীমও জেনেছে এই সীমাহীন জলরাশি আর গহন বনের বিস্তারে রূপলালের ইচ্ছাই বড়। তার স্বার্থে কেউ আঘাত করলে এমন কাণ্ড সহজেই ঘটাতে পারে সে।

—ওই-ই অনিমেষকে খুন করেছিল।

—অনিমেষ? কে সে?

—ওই করাতকলের ম্যানেজার। এখানেও আসতো। সুন্দর স্বাস্থ্য, শান্ত ভদ্র একটি তরুণ। আমিও তাকে ভালো করে চিনতাম। সে—

হঠাৎ করে পায়ের শব্দ পেয়ে থেমে যায় বিজলি। ও যেন বিপদের গন্ধ পায়।

বিজলি চাদরটা মুড়ি দিয়ে আর কোন কথা না বলে ভীতত্রস্ত ভাবে নিমেষের মধ্যে খোঁড়া পা-টা টেনে টেনে পিছনের বাগানের গাছ গাছালির আড়াল দিয়ে ওদিকে বাড়িতে ঢুকে গেল।

অসীম ওর এইভাবে চলে যাওয়ায় কিছুটা বিস্মিত হয়। তার পরেই এদিক থেকে রূপলালের কথা শোনা যায়।

—কি অসীমবাবু, একা একা বাইরে হিমে বসে আছেন এখনো? এই সময় হিম লাগানো ঠিক নয়। চলুন ভিতরে চলুন।

আজ রূপলাল হঠাৎ এসময় ফিরেছে।

ঘরের ভিতরে এসে বসেছে দুজনে, অসীম দেখছে রূপলালকে। এমনিতে সজ্জন, তাকে আশ্রয় দিয়েছে, বাঁচিয়েছে। কিন্তু অন্তরালে ওর

একটা অন্যমূর্তিও আছে।

এবার বুঝতে পারে অসীম কেন বিজলি ওইভাবে পালিয়ে গেল, বিজলি চেনে ওই লোকটাকে। দেখেছে ওর সেই অন্যরূপটাকেও— যেটাকে অসীম চেনেনা।

রূপলাল শুধোয়—কেমন আছেন?

অসীম জানায়—ভালোই আছি। এবার যাবো ভাবছি!

ওর কথায় রূপলাল বলে—কেন, এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে?

—না-না! অসীম বলে—ভালোই আছি।

রূপলাল বলে—এখানে আপনাদের মত ভদ্রলোক তো আসে না। এসে পড়েছেন দু-চারদিন থেকে যান। আমরা তো বাদাবনে পড়ে আছি। চারিদিকে জল। জলে কুমীর, কামট, ডাকাত—কি নেই! আর ঝঞ্ঝাট তো লেগেই আছে।

অসীম খবরের গন্ধ পেয়ে শুধোয়,

—আবার কি ঝঞ্ঝাট বাধলো? বেশ তো শান্ত জায়গা।

রূপলাল বলে—হ্যাঁ, শান্তই ছিল, তবে ওই জেলেরা—ট্রলারের লোকজন বড্ড গোলমাল পাকাচ্ছে। ব্যাটারা খুব বেড়েছে।

—কি করলো তারা? অসীম প্রশ্ন করতে এবার রূপলাল জানায়, —বলে, মহাজনরা নাকি ওদের ঠকাচ্ছে। হিসাবে মারছে, ওজনে মারছে। এবার ওরা সমবায় করে মাছ ধরবে, বিক্রী করবে। মহাজনের দাদনের টাকা মিটিয়ে দেবে কিস্তিতে।

অসীম শুনছে রূপলালের কথাগুলো।

বলে সে—হঠাৎ এসব আন্দোলন এখানেও সুরু করেছে?

এসব তো শহরের কলকারখানায় হয়, এই বাদাবনেও এসে পৌঁচেছে?

রূপলাল বলে—তাই দেখছি, বাইরের কোন লোকের উসকানি রয়েছে, খবর নিচ্ছি। তবে এখানে ওসব হতে দেব না। আমার উপর টেক্কা দেবে কেউ এখানে এসে তা হতে দেবনা।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে রূপলাল।

সেই অন্যমানুষের মুখোসটা যেন খুলে পড়ছে।

দেখছে অসীম তাকে। কঠিন একটি মানুষ। রূপলাল চুপ করে যায়। যেন হিংস্র বাঘ তার নখগুলো আবার থাবার অতলে লুকিয়ে নিচ্ছে।

বলে রূপলাল—চলি।

অসীম চকিতের জন্য সেই হিংস্র রূপটাকে দেখেছিল।

রূপলাল একে একে তার পথের কাঁটাগুলোকে সরিয়ে এখানে তার রাজত্ব কায়েম করেছে, অনিমেষকে শেষ করেও পার পেয়ে যায়।

তার লাশও মেলেনি, পুলিশ খোঁজ খবর করে থেমে যায়। রূপলাল ওই করাতকলও দখল করেছে আর ওই বিজলিকেও এখন তার হাতেই রেখেছে। ওকে ছাড়লে তার নিজের বিপদ হবে।

কর্তাদের ব্যবসাও ভালোই চলছিল, হঠাৎ এমনি দিনে ওই মাছের আড়তকে কেন্দ্র করেই গোলমালটা পাকিয়ে ওঠে।

মদন এখন ট্রলারে কাজ করে।

তাকেই রূপলাল দাদন দিয়েছিল অনেক দিন আগে কয়েক হাজার টাকা। সেদিনের কথা ভোলেনি রূপলাল।

কামিনী তখন গঞ্জে রয়েছে। রূপলাল কামিনীকে হাতে আনতে চায়।

কামিনী ওর ভাই মদনকে নিয়ে গোবর্ধন সাপুইয়ের মাছের আড়তে কাজ করে, গোবর্ধনও কামিনীকে দখল করে রেখেছে।

রূপলাল গোবর্ধনকে হটাবার চেষ্টাও করে যাতে কামিনীকে নিজের হাতে পায়, তার জন্য রূপলাল কামিনী, মদনকে ডেকে এনে বলে,

—মাছের আড়তে কুলিগিরি করে তোমার ভাই কত পায়?

কামিনী চেনে রূপলালকে, তার মতলবও বোঝে। কামিনী জানে রূপলাল তার রূপ যৌবনের জন্য দাদন কিছু দেবে। কামিনীও তাই বলে—কত আর পায়? ঘর খরচও চলেনা বাবু!

রূপলাল বলে—তোর ভাইকে নৌকা-জাল এসবের জন্য টাকা দেব,

ও মাছ ধরতে শুরু করুক।

কামিনীও খুশি হয়। বলে—তাহলে তো ভালোই হয়।

রূপলাল তাকে টাকা দিয়েছিল। মদন মাছ ধরতে শুরু করে।

আর কামিনীকে পাবার জন্য রূপলাল গোবর্ধনকে ওইভাবে ডুবিয়ে মেরেছিল নৌকার পাটাতন খুলে রেখে।

কিন্তু কামিনী মেয়েটা তার চেয়েও ধূর্ত।

সে ওই রূপলালের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল রতন সারেঙের সঙ্গে। অনেক খুঁজেও তাদের পাত্তা পায়নি। কামিনীও অধরাই রয়ে গেছে।

অনিমেষকে সে শাস্তি দিয়েছিল বিজলিকে নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করার জন্য, কিন্তু রতনকে পারেনি।

ওরা চলে গেছে এখান থেকে।

মদন এখানেই রয়েছে। এখনো মাছ ধরার কাজই করে সে। এখন নিজের নৌকা ছাড়াও ট্রলার ভাড়া নিয়েও দূর গাঙে সমুদ্রের খাড়িতে মাছ ধরতে যায়।

মরশুমে ওর ট্রলার নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের দিকেও যায়। ওদিকে তখন ইলিশ পমফ্রেট এসব ওঠে।

আর শীতের মরসুমে এই দিকে ওঠে সেরা জাতের বাগদা পমফ্রেট ভেটকি। এসব যায় রূপলালের আড়তে।

মদন, অন্যরা এতকাল এখানেই মাছ ধরতো। ইলিশের মরসুমে সেবার ডায়মণ্ডহারবারের গাঙে এসেছে। রাতে মাছ মারছে মেদিনী-পুরের ওদিকে বেশ কয়েকটা ট্রলারই রয়েছে।

মাছও উঠছে প্রচুর। জাল টেনে রূপালী মাছ তোলে তারা।

হঠাৎ অন্য ট্রলার থেকে তার নাম ধরে কাকে ডাকতে দেখে চাইল মদন।

ওদিকে ট্রলার থেকে কে ডাকছে তাকে। পরনে প্যাণ্ট, একটা গেঞ্জি, মাথায় একটা টুপি, ওতে মুখটা কিছুটা ঢাকা। সেই ডাকছে তাকে—মদন না? খলসেখালির মদন—

টুপিটা খুলতে এবার মদনও চিনেছে তাকে—রতন দা।

রতনদের খবর পায়নি অনেকদিন। মদনও গেছল দীঘায় তাদের সন্ধানে। কামিনীর কথাও মনে পড়ে, কিন্তু তাদের কোন খবরই পায়নি।

আজ এতদিন পর এই গাঙে দেখছে তাকে।

রতন এদের ট্রলারে আসে, বসে।

—কতদিন পর দেখা।

মদন বলে—কত খোঁজ করেছি তোমাদের। কোন খবরই পাইনি।

রতন বলে—তোমার ট্রলার নে চল দীঘায়। আমিও যাচ্ছি। মাল সেখানে দেবে, ভালো দাম পাবে। আর কথাবার্তাও হবে। তোমার দিদি তোমাকে দেখলে কি খুশিই না হবে।

মদনও শুধোয়—কেমন আছে দিদি?

রতন বলে—চলই না স্বচক্ষে দেখবে। আর মহাজনের ফাঁদে পড়ে কম পয়সায় মাল বেচিনা হে। আমাদের সমবায়ে মাছ দিই। বাজার দরে দাম পাই, তুমিও পাবে।

মদনও ট্রলার নিয়ে গাঙ পাড়ি দিয়ে সেবার দীঘাতে যায়।

দেখে রতন মিছে কথা বলেনি।

দীঘার এদিকে সুন্দর জেটি বরফ ঘর—জেলেদের থাকার জায়গা—ক্যানটিন সব রয়েছে। মায় ডিজেল নেবার জন্য দূরে যেতে হবেনা গাড়ি ভাড়া খরচ করে, সমবায় থেকে সেখানে পাম্পও বসানো হয়েছে, যার যত দরকার ডিজেল মবিল পাবে।

আর মাছের বাজারও বিরাট।

যে যার মাল কাঁটায় এনে ওজন করাচ্ছে। ওদিকে প্যাকিং করে বরফ দিয়ে মাছ চলে যাচ্ছে ট্রাকে। ক্যাশ থেকে ওজনের কাগজ—দেখিয়ে বাজার দর হিসাবে দামও মিটিয়ে নেয়।

ব্যাঙ্কও আছে। টাকা জমা দেয় সেখানে—দরকার মত টাকাও তোলে।

মদন বলে—খুব সুন্দর ব্যবস্থা তো রতনদা? ওজনে চুরি, হিসাবের

মারপ্যাচ নাই। থোক টাকা হাতে পেলাম তার জন্য সমবায় সমিতিকে একটা কমিশন দিয়েই খালাস! মহাজনরা তো শুষে নেয় আমাদের।

ওই রূপলালবাবু আমাদের ঘাম ঝরানো মাছ থেকে শালা বড়লোক হয়ে গেল। এখনো শুষছে।

ওর দাদনের টাকা এ জীবনেও শোধ হবেনা। মাছ নে এখানে এসেছি সে খবর ও পেয়ে চম্‌কে উঠবে।

রতন বলে—চিরকালই ও ওই বাদাবনের লোককে সর্বস্বান্ত করবে? তোমরা এর প্রতিকার করতে পারো না?

মদনও ভাবছে কথাটা।

কামিনীও এতদিন পরে ভাইকে দেখে খুশি হয়।

কামিনী আজ পায়ের তলে মাটি পেয়েছে। এতগুলো বছর ধরে রতনও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, কামিনীও তার সঙ্গে খেটেছে মাছ বেচেছে আর পয়সা জমিয়েছে।

তাদের এতদিনের চেষ্টায় এবার রতন দীঘায় এসে সরকার থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে সমবায় সমিতির থেকে ট্রলার কিনেছে।

কামিনীও মদনকে দেখে এবার খলসেখালির খবর নেয়। সেখানে এখনো মা রয়েছে, মেয়ের খবর পেলে সেও খুশি হবে।

কামিনী মদনকে বলে—এসেছিস এখানে দু-একদিন থেকে যা।

মদনও এখানে থেকে সমবায়ের কাজ দেখে খুশি হয়।

এরা নিজেদের রোজগারে এত সব করেছে। ভালোই আছে। মালিকের শোষণ এখানে নেই।

মদনও এবার ভাবছে তাদের অবস্থার কথা।

ওই রূপলাল মান্না তাদের শুষে চলেছে। দীঘার মরসুম চলে ক'মাস।

তারপর সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। তখন সমুদ্রে মাছধরা বন্ধ। সেই সময় মদনরা সুন্দরবনের নদী খাড়িতে তবু মাছ মারতে পারে। সেখানে তখন ইলিশ-ভেটকি-পারসে পমফ্রেট এসব মাছের প্রচুর আমদানী হয়

ওরাও এবার সমবায়ই করবে।

মদন ক'দিন এখানে থেকে সবকিছু দেখে সমবায়ের কাজ। রতনও এখন সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে অনেক সাহসী হয়েছে।

সে ভাবছে ওখানে মদনরা যদি সমবায় করে সেও সভ্য হবে ওদের। বর্ষার মরসুমে যখন এখানের কাজ বন্ধ হয়ে থাকে ওদিকে মাছ ধরবে।

কামিনীরও মনে পড়ে সেই সবুজ গঞ্জের কথা। সেখানেই মানুষ সে। বাইরে এসে মনে হয়েছে ওখানের মানুষজন রূপলাল মান্নার অত্যাচারের প্রতিবাদ করে না বলেই মানুষটা এত লোভী হয়ে উঠেছে।

কামিনী বলে মদনকে—চিরকালই তোরা ওই লোভী মানুষটার জুলুম সইবি? জবাব দিতে পারবি না?

মদনও ভাবছে, সব জেলেরা ওখানে যদি একজোট হয় তাহলে নিজেরাই সমবায় করে মাছ ধরবে, বেচবে, ওই মান্নাবাবুর টাকা ফেলে দেবে।

তার অন্যায় অত্যাচার আর সইবেনা, বলে মদন,

—এবার তার ব্যবস্থাই করবো রে। এতকাল আমাদের সব লুঠেছে ওই ডাকাত। আর এ হতে দেব না।

রতনও বলে—তোমরা একজোট হলেই দেখবে মান্নাবাবুও আর তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা তৈরি হও—তাহলে আমিও ওখানে গিয়ে বর্ষার ক'মাস মাছ ধরবো তোমাদের সঙ্গে।

কামিনীও স্বপ্ন দেখে সে আবার তার ফেলে আসা সেই গঞ্জে ফিরে যাবে।

কামিনীও বলে মদনকে—ওখানে গে ওইভাবে কিছু করার চেষ্টা কর মদন—আমরাও তাহলে যেতে পারি। তোদেরও সুরাহা হবে।

মদন এবার কথাটা ভাবছে। সে ফিরেছে ক'দিন পর খলসেখালির গঞ্জে।

এর মধ্যে হাওয়ায় খবরও ভেসে গেছে সেখানে মদন ট্রলার নিয়ে

দীঘায় মাছ ধরছে—সেখানের আড়তে মাল বেচছে।

রূপলালও শুনেছে খবরটা।

সনাতনও আড়তে বসে। সেদিন মদন আসতে দেখে সনাতন বলে।

—দাদন নিবি এখানে, আর মাছ দিবি অন্য জায়গায়?

ওদিকে অন্য জেলেরাও রয়েছে।

তাদের সঙ্গে ওজনের গোলমাল, বাজার দর নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হয় সনাতনের।

গুপী বলে—সব দিক থেকেই মারবে মহাজন? ওজন, দাম তো কম দেবাই, আবার সুদেও কাটবা। আমরা জাল টেনে কি পাই?

ইদানীং জেলেরাও খবর পায় হাসনাবাদ, ক্যানিংয়েও জেলেরা সমবায় করেছে। একটা চাপা প্রতিবাদ শুরু হয়েছে এখানেও।

মদনকে আজ রূপলাল নিজে গদিতে এনে বলে,

—মাল অন্যত্র দিবি, আমার দাদনের টাকা ফেলে দে তাহলে। না পারিস তোর জাল-ট্রলারই আটকাতে হবে।

মদন ওই জেলেদের খুবই প্রিয়।

ছেলেটা সকলের জন্য লড়ে। আজ তাকে বিপদে পড়তে দেখে এরাও ভাবনায় পড়ে।

রূপলাল বলে—দশ হাজার টাকা দাদন দিইছি—সুদ আর মাল ফেরৎ পেয়েছি মাত্র তিন হাজার। সাতহাজার বাকি। টাকা কি ঘাসের বীজ? মাছও দিবিনা—টাকাও দিবিনা, আটকা ওর ট্রলার—

মদন দু-তিন ক্ষেপ ইলিশ বেচে দীঘাতে প্রায় তেরো চৌদ্দ হাজার টাকা বাঁচিয়েছে। আজ বলে মদন—আপনার টাকাই দিচ্ছি—

—মানে। অবাক হয় রূপলাল।

মদন ওর কোমরের গেঁজিয়া থেকে দল পাকানো নোটগুলো দিয়ে বলে—পুরা সাতহাজার টাকাই আছে, গুনে নে রসিদ দাও সনাতনদা।

সনাতনও ভাবতে পারেনি মদন এভাবে জাল কেটে বের হয়ে যাবে। ওরা দাদনের টাকা ফেরৎ চায়না। সুদ আর তস্যসুদ দেখিয়ে ওদের টাকা ডিম পাড়ে। জেলেদের হিসাবও শোধ হয়না কোনদিন।

কিন্তু মদন বের হয়ে গেল হাত থেকে।

রূপলাল রসিদ দিতে মদন এবার যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

দেখছে তাকে অন্য জেলেরা। আজ তারাও স্বপ্ন দেখে এই রূপলালের হাত থেকে কবে তারা নিষ্কৃতি পাবে।

মদন চলে যেতে রূপলাল বলে—ব্যাটার দেখি বেশ তেল হয়েছে।

সনাতনও খুশি হয়নি। তারও কিছু আমদানী হতো কমিশন বাবদ ওর হিসাব থেকে। তা হয়নি, সনাতন বলে—তাই দেখছি।

—ওর ওপর নজর রাখ। রূপলাল ওকেও সন্দেহ করে।

কে জানে আবার কি গোলমাল বাধায়।

সন্ধ্যার পর মালোপাড়ার শিরীষ গাছের নীচে অনেকেই এসেছে। গুপী, নটবর, নিশাকর, কেষ্ট, জেলেদের অনেকেই।

মদন আজ তাদের কাছে একটা যেন ভরসাস্থলই হয়েছে। মদন বলে ওদের এবার সমবায়ের কথা।

—আমি ক্যানিংয়ের সমবায়ের লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারাও সাহায্য করবে। বসিরহাটের অফিসাররাও বলেছে, সরকারের কাছে সমিতি রেজিষ্ট্রি করালে ওরা সমবায়কে সরকারী ঋণও দেবে।

গুপী বলে—নিজেরা যা মাছ ধরি তার দামও কম নয়। পমফ্রেট, ইলিশ, পারসে এসবের দর দেয় পঁচিশ টাকা কেজি—বেচে ওরা পঞ্চাশ টাকা করে শহরের মহাজনদের। এক ক্ষেপে কত হাজার টাকা মারে বল?

এসব হিসাব এরা এবার করতে সুরু করেছে বাজারের দর চড়াতে।

নিবারণ বলে—সমবায়ই করবো মদনদা। বিষ্টুমাস্টারও বলেছে লেখাপড়া যা করার ও করে দেবে। শহরের কর্তাদের সঙ্গেও ওর চেনা জানা।

মদন বলে—ওসব হয়ে যাবে, কিন্তু আসল গোলমালটা হবে এখানেই।

—কেনে? গুপী বলে।

মদন শোনায়,

—মান্নাবাবু কি ছেড়ে দেবে তোমাদের? দাদনের টাকা—সুদ—এসবের জন্য চাপ দেবে আর ওর এত টাকা আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে ও কি চুপ করে বসে থাকবে?

এবার ওদের ভাবনা হয়।

কে বলে—সাংঘাতিক লোক, কে জানে কি ফ্যাসাদে না ফেলে আবার! ভাতে হাত পড়লে ও ক্ষেপে উঠবে।

গুপী বলে—ওখানে মাছ কেউ দিবিনা। আমি গোসাবার মহাজনের আড়ত থেকে দাদনের ব্যবস্থা করবো ছমাসের মেয়াদে। ছমাসের জন্য ওকে মাছ দেব, আর ওর টাকা ছমাসের মধ্যে মিটিয়ে দেব। ওই টাকা এনে সবাই মান্নাবাবুর দেনা শুধে দিবি। ব্যস—বাত খালাস। ওকে আর মাছ দেব না।

কেনারাম বলে—গোসাবার মহাজন লোক ভালো—ন্যায্য দামও দেয়, ওজনও পাকা, দ্যাখ ও যদি দাদন দেয়, ওই কড়ারে তাহলে তাই করবো।

মদন বলে ছমাসের মধ্যে আমাদের সমবায় হয়ে যাবে। সরকার থেকে ঋণ পেয়ে ও-টাকা গোসাবার মহাজনকে শুধে দিতে পারবো।

গুপী বলে—তাহলে কথা বলে আসি গোসাবায়, তোরা রাজী সবাই?

রাতের অন্ধকারে ওই বঞ্চিত মানুষগুলোর মুখে প্রতিবাদের কাঠিন্য ফুটে ওঠে। তারা আজ সোচ্চার হয়।

—আমরা রাজী। ওখানে আর মাছ দেব না।

ঘটনাটা কিছুদিন আগেই ঘটে গেছে।

আর ওই জেলেরা এতদিন চেপেই ছিল ঘটনাটা। তারা যথারীতি রূপলালের আড়তে মাছ এনেছে, ঝগড়াও করেছে। হিসাব মত কেটে কুটে রূপলাল যা দিয়েছে নিয়েছে ওরা।

রূপলাল ওদের ওই জীবন হাতে নিয়ে বাদাবনের গাঙ থেকে ধরে আনা মাছ বিক্রী করে হাজার হাজার টাকা কামিয়েছে।

মদন অবশ্য এখানে মাছ আনে না, সে মাছ পাঠায় গোসাবার

আড়তে, আর এর মধ্যে কাগজপত্র এনে সকলের সই করিয়ে বসিরহাট অফিসে—সদরে গিয়েও জমা দিয়ে তদ্বির তদারক শুরু করেছে। ক্যানিং-এর সমবায়ের সম্পাদক—হাসনাবাদের গুরুজন নেতাও তাকে এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য করছে।

কাজও এগোয়।

এর মধ্যে একদিন রূপলাল চমকে ওঠে ওই জেলেদের ব্যাপার দেখে। এই রকম একটা কাণ্ড ঘটবে তা ভাবতেও পারেনি। এতকাল এই বাদাবনের সেই ছিল সম্রাট। মুখবুজে জেলে বাওয়ালীর দল তার সব অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু এইভাবে ওই জেলের দল যে প্রতিবাদ করবে তা ভাবেনি রূপলাল।

রোজকার মত আড়তে গেছে সে।

সনাতন মাছের ওজন করার পাল্লা টাঙিয়েছে লোকজন দিয়ে। বড় বড় বাটখারাগুলোও এনেছে তারা।

ওদের দু-সেট বাটখারা আছে। একটা কেনার জন্য—সেটাতে কায়দা করে ভিতরে সিসে পুরে দশ কেজিতে নিদেন এক কেজি বাড়ানো থাকে।

আর বিক্রীর সময় সঠিক বাটখারাই চাপায় তারা। সব তৈরি। ট্রলার—নৌকায় মাছ আসবে। ওদিকে বরফও রেডি। বরফ দিয়ে মাছ চালান যাবে।

কিন্তু অবাক হয়।

মাছ আসেনা। জেলেরা সকলেই আসে।

রূপলাল গর্জে ওঠে—মুখ দেখাতে এলি। মাছ কই? দাদনের টাকা নিইছিস—

গুপীই বলে, হিসাবকিতাব বার করো সনাতন।

—মানে? সনাতন চাইল। বলে সে—ওসব রেডিই আছে। শুনবি?

সনাতন ওদের নামে বাকির হিসাব আওড়াতে থাকে।

গুপী বলে—আমাদের টাকা জমা করে রসিদ দাও।

—সেকি!

রূপলাল দেখছে ওদের।

গুপী বলে—নে, যে যার টাকা দিয়ে হিসাব চুকতা করে নে। রসিদ দাও টাকা নে!

রূপলাল বলে—মাছ—মাছের কি হবে?

গুপী বলে, সাতদিনের পুরোনো হিসাব চুকতা করে নতুন হিসাবে মাছ দেব। সুদ আর বইতে পারছিনা গো।

রূপলাল বলে ঠিক আছে।

সনাতন টাকা বুঝে নিয়ে রসিদ দেয় ওদের।

ওরাও উঠে পড়ে।

রূপলাল দেখছে ওদের।

দু-একজন হলে, ওদের চাবকে আজ পিঠের ছাল তুলতো কিন্তু এত লোককে ওসব করা সম্ভব নয়। তাই চুপ করেই দেখে ব্যাপারটা।

আজ মনে হয় ওই লোকগুলো এবার তার প্রাধান্যকেই যেন কঠিন আঘাত করতে চায়।

রূপলাল যা ভেবেছিল তাই-ই হয়।

পরদিন তার আড়তে ওদের কোন নৌকা, ট্রলারই আর মাছ আনে না। দু-চারজন জেলে ডিঙির মাঝি দশ বিশ কেজি মাছ আনে মাত্র, যা চালান দিলে হাসবে বসিরহাটের মহাজন, তেলের দামও উঠবে না।

তাই সনাতন বলে, আজ আড়ৎ বন্ধ।

ওরা হাটেই মাছ বেচে দেবে জলের দরে—বলে, আর এখানে মাছ আনবে না।

খবর আনে সনাতন সন্ধ্যার পরই।

রূপলালের মন মেজাজ ভালো নেই। মদ্যপানও করেছে তাই। সনাতন এসে জানায়—ব্যাটারা সব গোসাবার মহাজনকে মাছ দিচ্ছে।

—সেকি! আমার আড়ৎ তুলে দেবে? এতদিনের আড়ৎ!

সনাতন বলে, তাই দেখছি। আর ওদের লীডার ওই মদন, গুপী, কেনারাম। ওরা সদরে—বসিরহাটেও সমবায় করার দরখাস্ত দিয়েছে। এবার সমবায় করে মাছ ধরে চালান দেবে এখান থেকেই।

সনাতনের কথায় রূপলাল বলে—মদনার পিছনে কে আছে খবর নে।

সনাতন সে খবর নেবার চেষ্টা করে। এর মধ্যে সনাতন ওদের দলের নিশাকরকে হাত করেছে।

সনাতন বলে, খবর পেয়ে যাবো। লোক লাগিয়েছি।

রূপলালের বুকে বসে ওরা তার আড়ৎ তুলে দিয়ে এখানে সমবায়-এর আড়ৎ করে মাছ চালান দেবে এ কথাটা ভাবতেই পারেনা রূপলাল।

তার এতদিনের প্রতিষ্ঠাকে ওরা এভাবে আঘাত দিয়ে বিপর্যস্ত করবে তা ভাবেনি। এ কিছুতেই হতে দেবেনা রূপলাল। বলে সে, খবর নে। তারপর এর বিহিত করবো।

মদনরা কাজে নেমে পড়েছে।

এর মধ্যে ওদের গোপন মিটিংও হয়। নিশাকরও থাকে। ও ওদের একজন উৎসাহী সভ্য।

আর এদিকে নিশাকরকে সনাতন নগদ টাকা দেয়, ওর বাড়িতে এসে। বলে—সব খবর আমাকে দিবি। পরে তোকেই আড়তের সরকার করে দেব।

ওই পদটা খুবই লাভজনক। ওজনে মারো, দরে মারো, ঢলতা বাদ দাও, সবটাতেই টাকায় বার আনা কমিশন। মাইনে, জলপানি ছাড়া দিনে গড়ে পঞ্চাশ টাকা ফেলে ছড়িয়ে আসে। নিশাকর সেই স্বপ্ন দেখছে।

আর মদনদের সমবায় আন্দোলনেও উত্তপ্ত ভাষণ দেয়।

ওরা এর মধ্যে দীঘায় রতনের কাছেও গেছে। সেখানে ওদের কাজকর্ম দেখেছে, সমবায় মন্ত্রী ওখানে এসেছিলেন, মদনও এদের নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রতনের সাহায্যে। তিনিও এদের কাগজপত্র

নিয়ে উৎসাহিত করেন। সমবায় গড়ে তোলার সরকারি সাহায্য পাবে সে কথাও বলেন। এরাও খুশি।

রতনও বলে, তোমরা সমবায় গড়ো—আমিও যাবো সেখানে।

কামিনীও এতদিন পর তার গ্রামের লোকজনদের দেখে খুশি হয়। খুব আদর যত্নও করে এদের।

নিশাকর সবই দেখে।

এরাও অনেক আশা উৎসাহ নিয়ে ফেরে। সমবায়-এর নামও রেজেস্ট্রী হয়ে গেছে। সভাপতি করেছে এরা ওই রতনকেই।

তার চেষ্টাতেই এতসব কাণ্ড ঘটতে চলেছে। এদেরও দিন বদলাবে।

নিশাকর এসে এবার সনাতনকে ওদের পরিকল্পনার সব খবর দেয়।

রূপলাল এবার চমকে ওঠে।

—সেকি! ব্যাটাদের এই মতলব! এতদূর এগিয়েছে তারা?

সনাতন বলে—এর মূলে ওই রতন নস্কর আর কামিনী!

দুজনে এখান থেকে পালিয়ে যে এখন নিজেদের ট্রলার করেছে, পয়সাও করেছে। তারাই এদের মতলব দেছে আর এই খলসেখালি মৎস্যজীবী সমবায়ের সভাপতি হয়েছে ওই রতন নস্কর!

রূপলাল এবার চমকে ওঠে।

ওই রতন নস্কর তাকে ফাঁকি দিয়ে কামিনীকে নিয়ে চলে গেছল। সেদিন ওর মুখের শিকার ছিনিয়েছে রতন, আজ মহাপরাক্রমে তার এতদিনের আড়ৎ বন্ধ করেছে, আবার তার সামনে তার হারানো রাজ্য দখল করে নিজে সমবায়ের অফিস—আড়ৎ করবে।

রূপলালের প্রতিষ্ঠাকেই বিপন্ন করবে ওই রতন।

কামিনীর কথাও মনে পড়ে। সেই মেয়েটাকেও পায়নি।

এবার রতনকেই দেখবে রূপলাল।

অসীম এই নীরব আন্দোলনটাকেও দেখছে। শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে ক্ষুব্ধ জনতা—এই বাদাবনের একটি মানুষের প্রাধান্যকে তারা মানতে নারাজ।

রূপলালের ঘরেও দেখেছে একটি মেয়ের নীরব প্রতিবাদ।

বিজলি সেদিনও এসেছে সাবধানে।

গঞ্জের কিছু মানুষ এবার মাথা তুলছে ওই রূপলালের বিরুদ্ধে। তারা রূপলালের মাছের ব্যবসাও বন্ধ করেছে।

বিজলি বলে—ওই রূপলালের সব অপরাধের বিচার হবেই এক-দিন। ও খুনে—

—খুনে! অসীম অবাক হয়।

সন্ধ্যা নেমেছে। বিজলি কি ভাবছে।

বাতাসে ওঠে ঢেউয়ের মত্ত গর্জন। বিজলির চোখে সেই রাতের নিষ্ঠুর রূপলালের ছবিটা ভেসে ওঠে। বলে সে—ওই অনিমেষকে ওই-ই সেই রাতে খুন করেছিল।

ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমার কোমরে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরেছিল, সেই থেকে আমার এই অবস্থা! ও জানোয়ার।

বিজলির চোখ দুটো জ্বলে ওঠে।

অসীম দেখছে ওকে। রূপলালের অতীত ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড অধ্যায়গুলো জুড়তে পারে এখন।

একটা হিংস্র মানুষ তার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য সবকিছুই করতে পারে।

আর তার টাকার জোরও আছে।

এখানের পুলিশ, বনবিভাগের লোকরা তার হাতের পুতুল। তার কথামতই চলে ওরা।

শহরেও বেশ কিছু নেতা, কর্তাদেরও সে নানা ভাবে খুশি রাখে। তারাও রূপলালের সাম্রাজ্যে হাত দেয়নি। তাই একটার পর একটা অপরাধ করেও রূপলাল পার পেয়ে গেছে।

তার প্রতিপক্ষকে সে নানা ভাবে বিধ্বস্ত করে এসেছে এতদিন। তার কোন অপরাধেরই সাজা হয়নি। সেই অপরাধের জবর সাক্ষী ওই বন্দী মেয়েটা—যার জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে রূপলাল।

অসীম জীবন নাটকের নীরব শ্রোতা, দর্শকমাত্র।

রূপলাল বসে নেই।

তার লোকজনও এবার কাজে নেমেছে। ওই সমবায়ের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করতেই হবে তার।

সনাতনও যথারীতি সব খবরই পায় ওই নিশাকরের কাছ থেকে। নিশাকরও সমবায়ের দলের উৎসাহী কর্মী সেজে ওদের সব খবর আনে।

আর সেগুলো পৌঁছে যায় রূপলাল মান্নার দরবারে।

এবার গঞ্জে একটা সাড়া পড়ে।

ঘাটতলাতেও আলোচনা শুরু হয়। নতুন মৎস্য সমবায় গড়ে উঠেছে। আর কামিনীও এতদিন পর ঘরে ফিরছে।

অর্থাৎ রূপলাল মান্নাকে আর তারা ভয় করে না।

রূপলালের আড়ৎ-ও এখন বন্ধ।

এটা যেন রূপলালের পরাজয়েরই চিহ্ন। সনাতন বলে,

—কিছু একটা করতে দাও মান্না মশাই। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে তাই সইতে হবে? মদনটাকে সাবড়ে দিই, দেখবে সমবায় ফৌত হয়ে যাবে। আবার নাকে খৎ দিয়ে আমাদের আড়তেই আসবে ওই ভেড়ার দল।

রূপলাল আরও গভীরের কথা ভাবে। বলে সে,

—মাথা গরম করিস না। সময় হলেই দেখবি—কি করি। এখন চুপচাপ থাক। ওদের বাড়তে দে। তারপর ভর্তি গাজনে ঢাক ফাঁসাবি। এখন নয়।

সনাতন চুপ করেই থাকে।

মদনরা সমবায়ের অনুমতি পেয়েছে।

তারা ওদিকে মালোপাড়ার ঘাটে নতুন জেটি করেছে। বাঁধের ওদিকের মাঠে চালা ঘর উঠছে। এর মধ্যে একটা সাইন বোর্ডও লাগানো হয়েছে—খলসেখালি মৎস্য সমবায়।

পুরোদমে কাজ চলছে।

হাটতলার অনেকেই বলে—নাহ। মালোপাড়ার ওরাই রূপলাল মান্নাকে মুখের মত জবাব দিতে পেরেছে। বাপের ব্যাটা হে ওরা।

কে শোনায়—এতকাল মান্না মশাই ওদের লুটপাট করেছে। ওই মালোপাড়ার লোকের এবার চোখ ফুটেছে। চিরকাল কি লোককে দাবিয়ে রাখা যায় হে।

একটা শ্রেণী বেশ খুশিই হয় ওদের এই উত্থানে।

রূপলালবাবুর অত্যাচারে হাটতলায় বেশ কিছু মানুষও এবার মুখ খুলতে চায়।

সনাতনও দেখছে সেটা।

আর রূপলালও দেখেছে তার সেই সাম্রাজ্যের ভিতে যেন ফাটল ধরতে চলেছে।

সেদিন হাটতলার তোলা আদায় নিয়েই একটা ঘটনা ঘটে যায়।

এতকাল রূপলালের লোকজন সনাতনের নেতৃত্বে হাটবারে সব দোকানদারদের কাছ থেকে তোলা তুলতো। না দিলে তাকে বসতেও দিত না হাটে, কেনাবেচাও বন্ধ হয়ে যেতো তার।

তাই এসব ঝামেলা এড়াবার জন্য তারা তোলা দিত।

কিন্তু সেদিন মালোপাড়ার বেশ কিছু জেলে মাছ নিয়ে বসেছে হাটের ওদিকে একটা শিরীষ গাছের নীচে।

কেনা বেচা চলছে।

সনাতন লোকজন নিয়ে ওখানে গিয়ে দাবি করে—মাথাপিছু দশ টাকা করে দিতে হবে।

ওরা আগে সনাতনদের আড়তে মাছ দিত, এখন দেয়না। সব গোসাবায় যায় মাছ নিয়ে। আর ওরাও সমবায়ের সভ্য হয়েছে।

কেনারাম বলে—তোলা কেন দিব হে? এতো মান্নাবাবুর জায়গা নয়, ফরেস্টের জায়গা। তোলা দিতে হয় ওদের দিব, তোমাদের কেন দিব?

সনাতনের মুখের উপর জবাব দেবার সাহস এখন ওদের হয়েছে দেখে সনাতন চমকে ওঠে।

এ তার প্রতিষ্ঠার লড়াই।

মান্নাবাবুর লোক সে, সনাতন বলে, যা বলছি তাই কর। নাহলে—

রুখে ওঠে শশী মালো—নাহলে কি করবে হে? তোমাদের জায়গা ইটা? সনাতন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। গর্জায় সে—শশী!

শশীও রুখে ওঠে—কি করবা? মারবা?

সনাতন ওকে সপাটে চড় মারতে অন্য সকলেই এবার রুখে ওঠে। দু-একজন প্রতিবাদও করে, সনাতন তার লোকদের বলে—মার শালাদের—

ওরা তৈরি। বাঁক নিয়ে তারাও রুখে দাঁড়ায়।

বনবাবু বসন্ত গোলদার ব্যাপার দেখে এসে পড়ে গার্ডদের নিয়ে। সেই-ই কোনরকমে দুপক্ষকে থামায়।

—নাহলে ওখানেই খণ্ড যুদ্ধ বেধে যেত—বলে বসন্ত।

—সরকারি জায়গায় মারপিট করলে বিপদ হবে বাবা।

যাও সনাতন—আমি দেখছি। ওদের এই ফরেস্টের জায়গায় বসতেই দেব না।

খবরটা রূপলালের কানেও ওঠে।

সনাতন বলে—এই সব চলবে?

মান্নাবাবু বলে, মাথাগরম করিসনা। ঘা মারতে হয় আসল জায়গায় মারবি। কাজ হবে। নইলে ঝোপে ঝাড়ে লাঠি মেরে কি হবে?

সমবায়ের কাজ এগিয়ে চলেছে।

উদ্বোধনের দিনও ঘোষণা করে এরা। মালোপাড়ায় নয় সারা এলাকায় যেন একটা আশার আলোর সন্ধান পেয়েছে এরা।

এমনি দিনে রূপলালের কাছে এসে খবর দেয় নিশাকর—রতন কামিনীও আসছে সমবায়ের উদ্বোধনের আগে। ওরা এসে কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করবে।

রূপলাল শুনছে কথাটা।

বলে সে—ঠিক জানিস তো?

নিশাকর বলে—আজ্ঞে পাকা খবর। ট্রলার নে আসছে রতন—

কামিনী। ওরা এখানেই থাকবে ছ'মাস।

—ঠিক আছে, তুই যা।

ওকে সরিয়ে দিয়ে রূপলাল মদের গ্লাশ নিয়ে বসে।

মনে পড়ে অতীতের কথা।

সেই তরুণী কামিনী সেদিন তার মনে ঝড় তুলেছিল।

তার জন্য গোবর্ধন বারিককে মরতে হয়েছিল গাঙে ডুবে।

তবু কামিনীকে পায়নি।

ওই রতন সেদিন ওকে নিয়ে পালিয়েছিল। তার প্রতিষ্ঠার সৌধ-মূলে কঠিন আঘাতই করেছিল রতন।

আজ সেই রতনই তার এখানের প্রতিষ্ঠার মূলে চরম আঘাত হানতে চায়। সে এর জবাব দেবেই। রতন এখানে এসে বসলে বিপদ হবে রূপলালের। কামিনীও তার সামনে অধরা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এ রূপলালেরই পরাজয়। তাই তাকে এবার ব্যবস্থাই নিতে হবে।

অসীম দেখছে রূপলালকে। কেমন যেন চিন্তিত সে।

সাংবাদিক মানুষ, সে শুধোয়, —কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে আপনাকে?

মান্নাবাবু হাসে।

—না, না, আমি চিন্তা ভাবনা করি না মশাই!

উঠে যায় সে। বলে—চলি, একটু কাজ আছে।

চলে যায় সে।

বিজলি তার সহচরী কুসুমের মারফৎ সব খবরই পায়। গপ্পের গেজেট ওই মেয়েটা।

সে-ই বিজলিকে ওই সমবায়ের কথা বলে।

জানায় কামিনীর ইতিহাসও। বলে মেয়েটা—বাবুর ওর দিকে খুব নজর ছিল। তার জন্যই তো কামিনীর বাবু ওই আড়তদার বারিকমশাই জলে ডুবে মলো।

লোকে বলে—মান্না মশাই-ই নাকি ওকে ডুবিয়েছিল ওই কামিনীর

জন্যে। তা কামিনীও শ্যানা, ও পাইলে গেল ওই রতন সারেঙের সাথে।

বিজলি আর একটি মেয়ের কথা শুনছে।

রূপলাল কত মেয়ের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল কে জানে।

কুসুম বলে—সেই রতন নস্করই এস্তিছে কামিনীকে নে, মান্না-বাবুর নাকের ওপর ঝামা ঘসে দেছে মালোপাড়ার লোক।

বিজলিরও আনন্দ হয় রূপলালের এই পরাজয়ে। তাই অসীমকে সেও জানায় ওই কামিনী রতনের ইতিহাস। আজ রতনই পারবে ওর অন্যায়ের জবাব দিতে।

অসীম শুনছে বিজলির কথাগুলো।

তার মনে হয়, একটা ভালো নাটকই হবে এবার এই গঞ্জে। একটি মানুষের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে আজ একটি সমাজ।

সাংবাদিকের কাছে একটা ভালো খবরই।

বহুদিন পর কামিনী দেশে ফিরছে। আজ তার জীবনে এসেছে পূর্ণতার স্পর্শ। রতন তাকে ঠকায়নি। কাজের ছেলে সে। এর মধ্যে ক'দিন এসেছে এদিকে। বসিরহাটে বসেই সমবায়ের কাজ এগিয়ে নিয়েছে। এবার সব ব্যবস্থা করে ট্রলার নিয়ে আসছে। আজ সে একা নয়, কামিনীও সঙ্গে রয়েছে। আরো দু-একজন সঙ্গী রয়েছে।

হাসনাবাদ থেকে ট্রলার ছেড়েছে ওরা। মসৃণ গতিতে ট্রলার চলেছে বাদাবনের শেষ বসত খলসেখালির দিকে। রাতের গাঙ—তারা জ্বলে আকাশে। গাঙের বুকে তারই আভা। জল কেটে ট্রলারটা চলেছে।

রতন ঘুমুচ্ছে, ট্রলার চালাচ্ছে ভূতনাথ। গোবিন্দকাটির ট্যাঁক পার হয়ে রায়মঙ্গলের বিস্তীর্ণ বুক চিরে চলেছে ট্রলারটা ইঞ্জিনের একটানা শব্দ তুলে।

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা লঞ্চকে আসতে দেখে চাইল সে। লঞ্চের সব আলো নেভানো। আইনমতো মাস্টার লাইট একটা জ্বালাতে হয়, তাও নেই। লঞ্চটা বেগে এগিয়ে আসে এই দিকে। যেন ঘাড়েই পড়বে। ভূতনাথ হর্ন দিচ্ছে ব্যাকুলভাবে।

দিগন্তপ্রসারী গাঙে কুয়াশার ফিকে পর্দা নেমেছে। ওই শূন্যতার মাঝে আতঙ্কিত হর্নের শব্দটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে।

জেগে উঠেছে রতন। কামিনীও। রতন ডেকে এসে শুধোয়, —কি হলো রে?

রতনের মুখে এসে পড়ে ওদিকের লঞ্চ থেকে জোরালো সার্চ-লাইটের আলো।

রূপলাল নিজেই বের হয়েছে তার দলবল নিয়ে।

আগেই খবর ছিল সমবায়ের নেতা আসছে আজ রাতে। কাল ঘটা করে ওদের সমবায়ের উদ্বোধন হবে। মাছ-মারাদের রূপই বদলে গেছে। তারা যেন রূপলাল মান্নাকে আর চিনতেই পারছে না। রূপলাল তাই বের হয়েছে এই রাত গহনে।

সার্চ-লাইটের আলোয় দেখা যায় রতনকে এই লঞ্চ থেকে।

রূপলালও চিনেছে ছেলেটাকে। রূপলালের নিশানাও ভুল হয় না, আর ও জানে প্রথম সুযোগটাই নিতে হয়। তাই ওর হাতের বন্দুক গর্জে ওঠে। স্তব্ধ দিগন্ত কেঁপে ওঠে, নদীর বিস্তারে হারিয়ে যায় শব্দটা। ডেকের উপর ছিটকে পড়ে রতনের দেহটা—তার পরের গুলিটা এসে লাগে ভূতনাথের বুকে।

স্টিয়ারিংটা ওর হাত থেকে ছেড়ে যায়, রূপলালের লঞ্চও আর দাঁড়ায় না। অন্ধকার নদীর বিস্তারে হারিয়ে যায়।

রাতের বাতাসে কার আর্তনাদ ভেসে ওঠে, রতন! একি হলো রতন!

নদীর ঝড়ো বাতাসে হারিয়ে যায় কামিনীর কান্না। দিক্‌ভ্রান্ত ট্রলারটা ভেসে চলেছে আপন খেয়ালে।

সকাল হয় খলসেখালির গঞ্জে।

সকাল থেকেই মাছ-মারাদের উৎসব শুরু হবে। তারা এতদিনের কায়েমী শোষণ থেকে মুক্তি পাবে, এবার ওই রূপলালের ঋণের বেড়া-জাল, কঠিন শাসনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

তাদের প্রাণ হাতে নিয়ে বন, গাঙ থেকে তুলে আনা মাছের ন্যায্য দাম পাবে। রতন তাদের এই আশ্বাস দিয়েছিল। ওরা তাই এসেছে সকলে। কিন্তু রতন দাস আর অন্যদের দেখা নেই। অপেক্ষা করছে ওরা।

রূপলালের আড়ৎ বন্ধ। রূপলাল নিজেই আজ আড়ৎ বন্ধ রেখেছে। মাছের ব্যবসা আর করবে না এখানে। সেই জনতা অপেক্ষা করে আছে এখনো।

বেলা বাড়ে ক্রমশ। ধূ ধূ রোদ ওঠে গাঙের তেমোহনায়। এক জোয়ার পার হয়ে গেল। এমন সময় কে খবর আনে, সেই চরম সর্বনাশের।

কাল রাতে রায়মঙ্গল নদীতে রতনের ট্রলারে ডাকাতি হয়ে গেছে, ডাকাতরা রতন, ভূতনাথকে গুলি করে মেরেছে। ট্রলারটা ভাঁটার টানে সুন্দরবনের দিকে ভেসে গেছল রতনের বৌকে নিয়ে, কারা দেখতে পেয়ে ওদের নিয়ে আসে।

ট্রলারটাকে ওরা যখন নিয়ে আসে খলসেখালির গঞ্জে তখন সন্ধ্যা নামছে। ডেকে পড়ে আছে মৃতদেহ দুটো।

রতনের বৌ একা দিনভোর ওই ডেকে মৃতদেহের দিকে চেয়ে ঠায় বসে আছে। চোখ দুটো লাল, মাথার চুলগুলো বাঁধনহারা। মেয়েটার মনে যেন ঝড় উঠেছে।

স্তব্ধ গঞ্জের ঘাট।

ছুটে আসে মদন। আজ প্রায় দশ বছর পর কামিনী ফিরেছে গঞ্জে। কিন্তু রতনকে নিয়ে ফিরতে পারেনি। এনেছে মৃত রতনের দেহটা।

—কামিনী।

কামিনী বসে আছে ডেকে। এতদিন পর আবার নিজের মাটিতে ফিরেছে সে, যেখানে ফেরার জন্য তার মন কাঁদত। কিন্তু সে কি এমনিভাবে।

কত সাধ ছিল রতনকে নিয়ে এখানেই নতুন করে সংসার পাতবে। নিষ্ঠুর কোন ছায়ামূর্তি রাতের অন্ধকারে তার সেই সব সাধকে লুঠ

করে নিয়েছে।

—কামিনী! ওরে কামিনী! মদন ডাকছে তাকে।

খবরটা গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। কামিনীর ফিরে আসার খবর। কামিনীর বুড়ি মাও কোনোমতে টলতে টলতে ঘাটে আসে।

খবরটা শুনেছে রূপলালও। রতনের ট্রলারে ডাকাতির খবর, কারা তাকে মেরে ফেলেছে। রূপলালও নিপাট দরদী ভালোমানুষের মতো এসে পড়ে নদীর ঘাটে।

পুলিশফাঁড়ি থেকে হেড কনস্টেবল ফণীবাবুও কিছু আমদানির গন্ধ পেয়ে এসে পড়ে।

অসীম এখন প্রায় সুস্থ। সে বেড়াতে গেছল গাঙের ধারে ফরেস্ট অফিসের দিকে। সেও এসে পড়েছে।

রূপলাল এগিয়ে যায়। সে যেন অধীর হয়ে উঠেছে।

বলে সে, একি কাণ্ড ফণীবাবু? দেশে কি আইন নেই? গাঙে চলা-ফেরা করা যাবে না? নিরীহ লোকদের এইভাবে মারবে?

মদন, অন্য মাছমারার দলও বলে, দেখুন মাস্টারবাবু, কামিনীর কি সর্বনাশ করেছে দেখুন। মেয়েটা শোকে পাথর হয়ে গেছে।

—কামিনী! কোথায় সে? সে এই ট্রলারে—

হঠাৎ সকলে সচকিত হয়ে ওঠে।

কামিনী উঠে দাঁড়িয়েছে—দুচোখে তার শূন্য চাহনি। ঝোড়ো বাতাসে উড়ছে রুক্ষ চুলগুলো।

হেসে ওঠে কামিনী। হাসি নয়, যেন দুর্বার কান্নাই। বলে ওঠে কামিনী, এ্যা। তুমি!

এগিয়ে আসে কামিনী রূপলালের দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। সবাই অবাক। রূপলালও ঘাবড়ে গেছে। রাতের অন্ধকারেও কি মেয়েটা তাকে চিনে ফেলেছে? দেখেছে রতনকে গুলি করতে? সর্বনাশ।

ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ মেশে স্রোতের শব্দে। হঠাৎ আবার হেসে ওঠে কামিনী।

সব ফুরিয়ে গেল কামিনীর। বুঝলে মান্নামশাই, কামিনীও ফোত। কেমন মজা—এ্যা? হিঃ হিঃ হিঃ...

মেয়েটা কি প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে বদ্ধ উন্মাদই হয়ে গেছে?

জনতা স্তব্ধ হয়ে শোকবিহ্বল মেয়েটাকে দেখছে। হাঁফ ছাড়ে রূপলাল। বলে সে,

মদন পুলিশে লাশ নেবে। ফণীবাবু, কেস লেখো, তারপর লাশ ছেড়ে দাও। সৎকার হোক। আহা! পাগল হয়ে গেল বেচারা মেয়েটা!

স্তব্ধ মাছ-মারার দল। তাদের উপরও যেন বাজ পড়েছে। এখন কি হবে তাদের রুজি-রোজগারের পথ? কে বলে,

মান্নামশাই, আড়ৎ আবার চালু করুন। আমরা কোথায় যাবো?

অসীম ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে ব্যাপারটা। সাংবাদিক সে, খবরগুলো অনেক কিছুই জেনেছে সে। আজ ওই রূপলালের অতীত ইতিহাসও জেনেছে সে। দেখেছে মেয়েটাকে প্রথমে চমকে উঠতে ওই রূপলালকে দেখে। তারপরই যেন ফেটে পড়ে মেয়েটা কঠিন হাসিতে।

রূপলালকেও ঘাবড়ে যেতে দেখেছে অসীম। কিন্তু মেয়েটাকে পাগলের মতো হাসতে দেখে রূপলাল নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পাগলই হয়ে গেছে কামিনী।

আজ মাছের আড়তের কথাতে জবাব দেয় রূপলাল, দেখছি, কি করা যায়।

অর্থাৎ ওদেরও কিছুটা শিক্ষা দেবে রূপলাল, তার সঙ্গে বেইমানি করে এখানে কেউ বাঁচতে পারবে না।

—শয়তান! জানো এ ওই শয়তানের কীর্তি। কামিনীকেই লুঠ করতে গেছল। কাল অনেক রাতে ফিরেছে। আমি দেখছি ওর দুটো টোটা কম। দুটো লোককে আবার খতম করেছে নিশ্চয় ও। একদিন ঠাণ্ডা মাথায় অনিমেষকে খুন করেছিল। কাল করেছে রতনকে।

ফিসফিস করে কথাটা বলছে বিজলি। অসীম ঘাট থেকে ফিরছে।

ও ভাবতে পারেনি বিজলি এমনি সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে বাগানে ধরবে। মুখে পাউডারের ঘন প্রলেপ। ঠোঁট দুটোয় লিপস্টিক মেখে রক্তলাল, বীভৎস করে তুলেছে নিজেকে।

বিকৃত ধ্বংসস্তূপের মতো বিজলি আজ চাপা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বলে, কিছু করতে পারো না তোমরা? এমনিভাবে বাদাবনের বাঘের মতো সকলের রক্ত শুষে খাবে, শেষ করবে ও?

অসীম ওকে থামাবার চেষ্টা করে,

কি যা তা বলছেন? যান—

বিজলি অবাক হয়ে দেখছে ওকে। হতাশাভরা কণ্ঠে বলে, জানি ও তোমাকেও কিনে নিয়েছে টাকার জোরে—

হঠাৎ সামনে ছায়ামূর্তির মতো রূপলালকে দেখে থেমে যায় বিজলি। ওর মুখে জমাট আতঙ্কেরই ছায়া নামে। সামনে যেন কোনো বিষধর সাপকেই দেখছে, যে এখুনি ওকে বিষছোবল মারবে।

ভীতত্রস্ত মেয়েটা পালালো।

অসীম দেখছে রূপলালকে। কে জানে কতটা শুনেছে রূপলাল ওই মেয়েটির কথা। রূপলাল বলে, আমার স্ত্রীর ইদানীং মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। কি বলে তার ঠিক নেই।

অসীম দেখছে ওকে।

রূপলাল বলে, কাল ভোরে আমার লঞ্চ যাচ্ছে বসিরহাটে, ওতেই যেতে পারবেন। ওখান থেকে ট্রেনে কলকাতা।

অসীম বলে, হ্যাঁ, —ওখান থেকে ফেরার অসুবিধা হবে না। ক'দিন এসে আপনাদের বিব্রত করে গেলাম।

রূপলাল বলে, না, না।

ভোরের কুয়াশাভরা গাঙ। লঞ্চটা চলেছে এদিকের তীরভূমি ঘেঁষে। পিছনে পড়ে রইল খলসেখালির গঞ্জ, সামনে পুঁইজালির হাটতলা। দেখা যায়, অনিমেষের করাতকল।

অতীতের অভিসারিকা বিজলি আসত এখানে। অসীমের মনে পড়ে

সেই করুণ ইতিহাস। বিজলির ব্যর্থ জীবনের পরিণতি কি তা জানে না অসীম। দেখেছে কামিনীকে, এই গঞ্জের মানুষদের। ওই রূপলাল যেন এই আরণ্যক পরিবেশে একক একটি সত্তা, যে এই গাঙের মতোই রহস্যময়, বনের বাঘের চেয়েও হিংস্র, নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু।

খলসেখালির গঞ্জের মানুষ এই নিষ্ঠুরতার মাঝেও বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে।

—